তাওহীদ ও আকাইদ

[বাংলা]

التوحيد والعقيدة

« اللغة البنغالية »

লেখক : সানাউল্লাহ নজির আহমদ / কামালুদ্দিন মোল্লা / ইকবাল হোসাইন মাসুম

تأليف: ثناء الله نذير أحمد – كمال الدين ملا – إقبال حسين معصوم

সম্পাদনা : আব্দুলাহ শহীদ আব্দুর রহমান / নুমান বিন আবুল বাশার / কাউসার বিন খালিদ

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن – نعمان بن أبو البشر – كوثر بن خالد

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচিপত্র

আল্লাহ তাআলার হক বা প্রাপ্য

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের জলে-স্থলে, শরীরে ও দিগন্ত জুড়ে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামতরাজি দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। তিনি এরশাদ করেন—

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً : ﴿ سورة لقمان:٢٠﴾

'তোমরা কি দেখ না আল্লাহ তাআলা নভোমন্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ?'[১] অন্যত্র বলেন—

وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ﴿سورة إبراهيم : ٣٤﴾

'যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি-ই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। আফসোস ! মানুষ সীমাহীন অন্যায় পরায়ন, অকৃতজ্ঞ।'[২]

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهَّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ سورة النحل : ١٨﴾

'যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৩]

তবে বান্দার উপর সবচেয়ে বড় নেয়ামত : রাসূল সা.-কে প্রেরণ করা, কিতাব অবতীর্ণ করা ও ইসলামের হেদায়াত দান করা। এ জন্য বান্দা হিসেবে আমাদের উপর ওয়াজিব আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য অধিকার বা হকসমূহ জানা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবশ্যকীয় ও বাধ্যতামূলক হকসমূহ আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকা। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হক তথা অধিকারের বিবরণ তুলে ধরা হলো :—

১ সূরা লোকমান : ২০।

২ সূরা ইবরাহিম : ৩৪।

৩ সূরা নাহাল : ১৮।

প্রথম অধিকার : আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা

আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে :—

এক : আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ঈমান বা বিশ্বাস। দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা, অবোধ কিংবা অন্ধ ভাবে নয় : যেমন—আল্লাহ তাআলার মাখলুকাত তথা সৃষ্টি জগত দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া কোন সৃষ্টি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে কিংবা অস্তিত্বে আনতে পারে না—কারণ প্রত্যেক জিনিসই তার অস্তিত্বের পূর্বে বিলুপ্ত, অবিদ্যমান ও অস্তিত্বহীন থাকে—বিধায় সৃষ্টি করার প্রশ্নই আসে না। আবার কোন জিনিস হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে বা দৃশ্যপটে চলে আসবে তাও সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি ঘটমান বস্তু বা সম্পাদিত কাজের নেপথ্যে সংঘটক বা সম্পাদনকারী থাকা জরুরি।

অতএব, যখন আমরা জানতে পারলাম এ বিশ্বজগত নিজে-নিজেই দৃশ্যপটে চলে আসেনি, আবার অকস্মাৎ তৈরি হয়েও যায়নি, তাই আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল, এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আর তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

দুই : রুবুবিয়্যাতের ঈমান : আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতের উপর ঈমান রাখা—অর্থাৎ সৃষ্টি তার, মালিকানা তার, পরিচালনার দায়িত্ব তার, তিনি ছাড়া কেউ মালিক নয়, কেউ পরিচালনাকারী নয়। এরশাদ হচ্ছে—

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. ﴿ سورة الأعراف:٥٤﴾

'শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা।'[১]

আরো বলেন—

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. ﴿ سورة فاطر:١٣﴾

'তিনিই আল্লাহ ! তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটিরও অধিকারী নয়।'[২]

দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে, অন্তরের সাক্ষ্য, প্রাকৃতিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করেছে।

১ সূরা আল আরাফ : ৫৪

২ সূরা ফাতের : ১৩

তবে এমন অনেকেই আছে, যারা জেদ ধরে অহংকার বশত, নিজের কথায় আস্থা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত অস্বীকার করেছে। যেমন- ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল—

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. ﴿سورة النازعات:٢٤﴾

'আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।'[১] অন্য জায়গায় বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. ﴿سورة القصص:٣٨﴾

'হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে কি-না।'[২] ফেরআউন নিজের উপর আস্থা কিংবা বিশ্বাস রেখে একথা বলেনি, কারণ আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. ﴿سورة النمل:١٤﴾

'তারা অহংকার করে নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।'[৩] মূসা আ. ফেরআউনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. ﴿سورة بني اسرائيل:١٠٢﴾

'তুমি জান, যে আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাজিল করেছেন। হে ফেরআউন, আমার ধারণা তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।'[৪]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার الألوهية। 'উলুহিয়্যাতে' শরিক করেও الربوبية। 'রুবুবিয়্যাতে'-কে স্বীকার করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

---

১ সূরা আন নাযেআত : ৩৮

২ সূরা আল কাসাস : ৩৮

৩ সূরা আন নামল : ১৪

৪ সূরা বনী ইসরাইল : ১০২

﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. ﴿ سورة المؤمنون:٨٤-٨٩﴾

'বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কারা ? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবে : সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না ? বলুন : সপ্ত আকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে ? এখন তারা বলবে : আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? বলুন : তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এখন তারা বলবে আল্লাহর। বলুন : তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ?'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. ﴿ سورة الزخرف : ٩﴾

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।'[২] আরো এরশাদ হচ্ছে—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ سورة الزخرف : ٨٧﴾

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? তবে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ।'[৩]

তিন : আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাতের ঈমান :—

অর্থাৎ 'আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলাই একমাত্র উপাস্য' এ কথার উপর ঈমান রাখা। যথা তিনি সত্যিকারার্থে প্রভু। বিনয় ও মহব্বত সম্বলিত এবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া কেউ এবাদতের উপযুক্ত নয়। এরশাদ হচ্ছে—

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. ﴿ سورة البقرة : ١٦٣﴾

'আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া মহান করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।'[১] আরো এরশাদ হচ্ছে—

---

১ মুমিনুন : ৮৪-৮৯

২ সূরা যুখরুফ : ৯

৩ সূরা যুখরুফ : ৮৭

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. ﴿ سورة يوسف:٣٩-٤٠ ﴾

'পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের ব্যাপারে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।'[২]

আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত জিনিসগুলোর প্রভুত্ব কিছু যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন :—

১. মুশরিকরা যে সমস্ত বস্তুকে প্রভু বানিয়েছিল, তাদের ভিতর প্রভুত্বের কোন গুণ বিদ্যমান নেই। এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না, কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং তাদেরকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারে না। এরা তাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক নয়। আসমান-জমিনের মাঝে কোন জিনিসের মালিক নয় এবং এতে তাদের অংশীদারিত্বও নেই। এরশাদ হচ্ছে—

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. (سورة الفرقان:٣)

'তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট, নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। জীবন, মরণ এবং পুনরুজ্জীবনেরও মালিক নয় তারা।'[৩] আরো এরশাদ হচ্ছে—

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. (سورة الأعراف:١٩١-١٩٢)

'তারা কি এমন কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে !'[৪]

---

১ সূরা আল বাক্বারা : ১৬৩

২ সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০

৩ সূরা আল ফুরকান-৩

৪ সূরা আল আরাফ : ১৯১-১৯২

তাদের বানানো প্রভুদের এমন অসহায়ত্ব ও দুরবস্থা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে এগুলোকে প্রভু বানানো নিরেট বোকামি, চরম বাতুলতা।

২. মুশরিকরা বিশ্বাস করতো—আল্লাহ তাআলাই প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, তার হাতেই সমস্ত জিনিসের মালিকানা, তিনি রক্ষা করেন, তার কবল হতে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ سورة الزخرف : ٨٧﴾

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।'[১] আরো এরশাদ হচ্ছে—

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. (سورة يونس:٣١)

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন ? এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন ? কে করেন কর্ম-সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ ! তুমি বল, তারপরেও ভয় করছ না ?'[২]

তারা যখন নিজেরাই এর সাক্ষ্য প্রদান করল, যুক্তির ভিত্তিতে এখন তাদের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র প্রভু, একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার এবাদত করা। ধারণা প্রসূত ঐ সমস্ত প্রভুদের নয়—যারা নিজেদের কোন উপকার করতে পারে না। নিজেদের থেকে কোন বিপদ হটাতে জানে না।

চার : আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের ঈমান :—

বান্দা হিসেবে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে। যে সমস্ত নাম ও সিফাত (বিশেষ্য ও বিশেষণ) আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব অথবা রাসূল সা. স্বীয় হাদিসে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত হিসেবে আল্লাহ

১ সূরা আদ দুখান : ৮৭

২ সূরা ইউনুস : ৩১

তাআলার অবস্থান মোতাবেক বিশ্বাস করবে, একমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য বলে জ্ঞান করবে। কোন ধরনের অপব্যাখ্যা, নিষ্কর্ম করণ, আকৃতি প্রদান ও সামঞ্জস্য বিধান করবে না। এরশাদ হচ্ছে—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سورة الأعراف:١٨٠)

'আর আল্লাহর রয়েছে উত্তম নাম সমূহ, কাজেই সে নাম ধরেই তাকে আহ্বান কর। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. (سورة الشورى:١١)

'কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, দেখেন।'[২]

দ্বিতীয় অধিকার : পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতাসহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য এবাদত উৎসর্গ করা : যার পদ্ধতি হলো—বান্দা তার আমলের মাধ্যমে একমাত্র তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. (سورة الزمر:٢)

'আমি আপনার উপর এ কিতাব যথার্থ-ই নাজিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলার এবাদত করুন।'[৩] আরো বলেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (سورة الأنعام:١٦١-١٦٢)

'আপনি বলুন : আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য। তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্য পোষণকারী।'[৪] সহিহ হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

১ সূরা আল আরাফ-১৮০

২ সূরা আশ শুরা : ১১

৩ সূরা আয যুমার : ২।

৪ সূরা আল আনআম-১৬১-১৬২।

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه برىء.

'আমি সমস্ত অংশীদারদের ভিতর বেশি অমুখাপেক্ষী, যে এমন আমল করল, যার ভিতর সে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে, সে আমল ঐ অংশীদারের জন্য, আমি তার থেকে মুক্ত।'

মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, আমি একটি গাধার পিঠে রাসূলের সঙ্গী ছিলাম। যে উটকে 'উফাইর' বলা হয়। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন—

يا معاذ هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم،قال: (فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئا) فقلت : يارسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لاتبشرهم فيتكلوا. (رواه البخاري ومسلم)

'হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার কি কি হক রয়েছে ? এবং আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার কি কি হক রয়েছে ? আমি উত্তর দিলাম— আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার হক হচ্ছে : তারা তাঁর এবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না। আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার হক হচ্ছে, যে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমি কি সকলকে এর সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন তাদের সুসংবাদ দিওনা, তাহলে তারা কর্মহীন হয়ে যাবে।'[১] রাসূল সা. আরো বলেন—

إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك فى عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك). (رواه الترمذي وقال حسن غريب)

১ বোখারি ও মুসলিম

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকান না। তবে তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান। রাসূল সা. আরো বলেছেন—কেয়ামতের দিবসে—যে দিবসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই—যখন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে জমা করবেন, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি তার আমলের ভিতর অন্য কাউকে শরিক করেছে, সে যেন তার সওয়াব আল্লাহ তাআলা ছাড়া যাকে শরিক করেছে তার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সমস্ত শরিকদের থেকে অমুখাপেক্ষী।[১]

একজন বান্দা হিসেবে সকলের জন্য জরুরি—এবাদত বিষয়ে আন্তরিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং সেভাবে আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য আদায় করা, এর বিপরীত অর্থাৎ শিরক হতে বিরত থাকা ।

তৃতীয় অধিকার : আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালন করা ও নিষোধাবলী পরিহার করা :—

বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় হক হল, তার আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অর্থবহ আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ سورة محمد : ٣٣﴿

'হে মোমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট কর না।' (মোহাম্মদ:৩৩) আরো বলেন—

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(سورة آل عمران:١٣١-١٣٣)

'এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সা.-এর আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের উপর রহমত নাজিল করা হয়।[২] আরো এরশাদ হচ্ছে—

قُلْ أَطِيعُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَّ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. (سورة آل عمران:٣٢)

---

১ হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাসান গরিব

২ আলে ইমরান : ১৩১-১৩২

'বলুন, আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।'[১] আরো বলেন—

وَأَطِيعُوا اللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

(سورة المائدة:٩٢)

'তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগত হও এবং রাসূল সা.-এর অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়।'[২] আরো বলেন—

وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

(سورة الفتح:١٧)

'যে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।'[৩] আরো বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. (سورة الأحزاب:٣٦)

'আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'[৪]

হে মুসলিম সম্প্রদায়, আমাদের সকলের জন্য একান্ত জরুরি আগ্রহভরে ও যত্নসহকারে আল্লাহ তাআলার এ সমস্ত হক আদায় করা। যাতে আমাদের ভিতর প্রকৃত মোমিনের গুনাবলী বদ্ধমূল হয়। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (سورة البقرة:٢٨٥)

---

১ সূরা আলে ইমরান-৩২

২ সূরা আল মায়েদা : ৯২

৩ সূরা আল ফতাহ : ১৭

৪ সূরা আল আহযাব : ৩৬

'তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকার্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[১]

চতুর্থ অধিকার : আল্লাহ তাআলাকে সম্মান প্রদর্শন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা :—

বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রাপ্য অধিকার সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা। যা কয়েক ভাবে প্রদান করা যায়।

১. আল্লাহ তাআলাকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করা। মর্যাদাপূর্ণ ও পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত মনে করা। যেভাবে তিনি নিজেকে কুরআনে গুণান্বিত করেছেন অথবা যেভাবে তার রাসূল সা. হাদিসে সম্বোধন করেছেন।

২. তার আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তার বর্ণিত সীমারেখার ভিতর স্বীয় জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِّٰ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. (سورة الحج:٣٠)

'আর কেউ আল্লাহ তাআলার সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম।'[২] আরো বলেন—

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِّٰ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. (سورة الحج:٣٢)

'আর যে আল্লাহ তাআলার নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ ভীতি প্রসূত।'[৩]

আল্লাহ তাআলাকে সম্মান প্রদর্শন করা, তার নিদর্শনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তার বর্ণিত সীমারেখার ভিতর জীবন পরিচালনা করাই অনুসরণীয় অগ্র-পথিক সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী নেককার লোকদের আদর্শ ছিল।

পঞ্চম অধিকার : আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করা, তার নিকট আশা করা এবং তাকে ভয় করা

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে—

---

১ সূরা আল বাক্বারা : ২৮৫

২ সূরা হজ : ৩০

৩ সূরা আল হাজ্ব : ৩২

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. (سورة الذاريات:٥٦-٥٨)

'আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমাকে আহার্য জোগাবে। আল্লাহ তাআলাই তো জীবিকা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।'[১]

বর্ণিত তিনটি মূল ভিত্তির উপর আল্লাহ তাআলার এবাদত নির্ভরশীল। অর্থাৎ ১. মহব্বত। ২. আশা। ৩. ভয়।

ষষ্ঠ অধিকার : নেয়ামতের মোকাবিলায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা :—

আল্লাহ তাআলার অগণিত ও অসংখ্য নেয়ামত নিরবচ্ছিন্নভাবে তার বান্দার উপর বর্ষিত হচ্ছে, যেমন—সৃষ্টির নেয়ামত, ধন-সম্পদের নেয়ামত, ইসলামের নেয়ামত, পানির নেয়ামত, বাতাসের নেয়ামত, বিবেক, শরীর, স্ত্রী ও সন্তানদের সুস্থতার নেয়ামত। তাই বান্দাদের উচিত এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। যা তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে সুচারুরূপে আদায় করা যায়।

১. নেয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদানমূলক কৃতজ্ঞতাসহ তা গ্রহণ করা। অর্থাৎ বান্দা একনিষ্ঠ ও আন্তরিক ভাবে স্বীকার করবে যে আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও মেহেরবাণীতে এ নেয়ামত দান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে—

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. (سورة النحل:٥٣)

'তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে।'[২]

সুতরাং স্বীয় প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাববোধসহ আগ্রহভরে আল্লাহর নেয়ামত গ্রহণ করা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়া।

২. দান-সদকা পোশাক-আশাক ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের বহি:প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা।

অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের আলোচনা করবে। তার দয়ার প্রতিফলন এ নেয়ামতরাজি—সর্বদা মনে করবে। এরশাদ হচ্ছে—

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (سورة الضحى:١١)

'আর আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।'[১]

---

১ সূরা আয যারিয়াত : ৫৬-৫৮

২ সূরা আন নাহল-৫৩

আরো মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ তাআলা দানশীল, অনুগ্রহকারী, রহমশীল ও দয়ালু।

৩. আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় জায়গায় নেয়ামত ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত জায়গায় নেয়ামতের ব্যবহার সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। শরিয়ত-নিষিদ্ধ জায়গায় অপচয় করা হতে বিরত থাকবে। কারণ, এটা নাফরমানি, অকৃতজ্ঞা। যা শরিয়ত কিংবা বিবেক দ্বারা কোনভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়।

সপ্তম অধিকার : তাকদীর মেনে নেয়া এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকা :—

আল্লাহ তাআলা কতিপয় বান্দাদের মুসিবতের মাধ্যমে অথবা নেয়ামতের মাধ্যমে কিংবা উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন—এরশাদ হচ্ছে—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. (سورة محمد:٣١)

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'[২] এরশাদ হচ্ছে—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. (سورة البقرة:١٥٥)

'এবং আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য্য অবলম্বনকারীদের।'[৩]

পরীক্ষামূলক এ সমস্ত মুসিবতের মোকাবিলায় বান্দার উচিত ধৈর্যধারণ করা ও তাকদীরকে মেনে নেয়া। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ-ই প্রদান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا .(سورة آل عمران:٢٠٠)

'হে ইমানদারগণ ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর।'[৪]

---

১ সূরা দোহা : ১১

২ সূরা মোহাম্মদ : ৩১

৩ সূরা আল বাক্বারা : ১৫৫

৪ সূরা আলে ইমরান-২০০

তাওহীদ: ফজিলত, আলামত ও প্রকার

তাওহীদের সংজ্ঞা

তওহিদ : আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এক ও একক সর্বাধিপতি প্রতিপালক। তিনি রাজত্ব, সৃষ্টি, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্বের অধিপতি। এতে কোন অংশীদার নেই। এককভাবে তিনিই প্রভু। এবাদত, আনুগত্য, আশা-ভরসা, সাহায্য ও ফরিয়াদের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তার সাথে অংশীদার করা জায়েজ নেই। তিনি সুন্দর নামসমূহ ও মহান গুণাবলির অধিকারী, তার সদৃশ কোন জিনিস নেই। তিনি সর্ব-শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

তাওহীদের মর্যাদা ও আলামত

১. তওহিদ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ ও তার আনুগত্যের সর্বোত্তম ও সর্ব শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এ তাওহীদের বার্তা দিয়েই তিনি রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং এর ব্যাখ্যার জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে—

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. (سورة إبراهيم:١)

'এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি—যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।'[১]

অর্থাৎ শিরকের অন্ধকার হতে তাওহীদের আলোতে।

২. তিনি তাওহীদের পরীক্ষা নেয়ার লক্ষ্যে জিন জাতি, মানবজাতি, ইহকাল-পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। যে এ তাওহীদ গ্রহণ করবে সে সৌভাগ্যবান, চিরসুখী। আর যে তাওহীদ প্রত্যাখ্যান করবে সে হতভাগা, চির দুঃখী।

৩. তাওহীদ বিহীন আমল যত বড় কিংবা যত ভালই হোক—অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত ও মূল্যহীন। এরশাদ হচ্ছে—

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سورة الأنعام:٨٨)

১ সূরা ইবরাহিম : ১

'যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।'[১]

৪. নবী-রাসূলগণ তাওহীদের অনুশীলন, বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কষ্ট সহ্য করেছেন, তাদের অনুসারীগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। কেউ ত্যাগ করেছেন নিজের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত ও মান-সম্ভ্রম। কেউ তার প্রয়োজনীয় আহার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। কেউ বিসর্জন দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নিজের আত্মমর্যাদা পর্যন্ত। কেউ স্বীয় দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন...ইত্যাদি।

তাওহীদের নিদর্শন বা আলামত

যেহেতু অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত তাওহিদ—কল্যাণকর, হিতকর ও সুউচ্চ স্থানের অধিকারী সেহেতু তার আল্লাহ প্রদত্ত বিস্তৃত কল্যাণ, প্রচুর সুফল ও অনেক উপকার দুনিয়া-আখেরাত তথা উভয় জগতে মোহনীয়, আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। নিম্নে প্রধান প্রধান কতিপয় সুফলের নমুনা তুলে ধরা হল :—

প্রথমত : দুনিয়াবী সুফল : তাওহীদের বদৌলতে আমরা বিস্তর-বেহিসাব, সুফল-কল্যাণ অর্জন করে থাকি। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. তাওহিদ মানে সত্য ও সততাকে আঁকড়ে ধরে ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হওয়া। মূর্খতা, কুসংস্কার, ধারণাব্রতীতা ও ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে থাকা। এরশাদ হচ্ছে—

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. (سورة لقمان:٣٠)

'এ দ্বারাই প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলাই সত্য এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা।'[২]

২. তাওহিদ মানে জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জন করা। অবৈধভাবে কারো উপর অত্যাচার বা সীমা-লঙ্ঘন করা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা। রাসূল সা. বলেন—

أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.

---

১ সূরা আনআম : ৮৮

২ সূরা লোকমান : ৩০

'আমি মানুষের সাথে জেহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা لاإله إلا الله না বলবে। যখন তারা لاإله إلا الله বলবে, আমার থেকে তাদের জান-মাল নিরাপদ করে নিবে। তবে শরিয়তের বিধি মোতাবেক—শাস্তির উপযুক্ত—হলে ভিন্ন কথা।'

৩. তাওহিদ মানে উৎকৃষ্ট জীবন ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা। এরশাদ হচ্ছে—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. (سورة النحل:٩٧)

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদের পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[১]

পক্ষান্তরে তাওহিদ প্রত্যাখ্যান করে যে নিমজ্জিত থাকে শিরকের অন্ধকারের অতল গহ্বরে—সে খুবই ভাগ্যহত, আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বিতাড়িত এবং সংকীর্ণতার দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য। এরশাদ হচ্ছে—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.(سورة طه:١٢٤)

'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।'[২]

৪. তাওহিদ মানে সাম্য-মৈত্রী ও ন্যায়-ইনসাফের বাস্তব অনুশীলন। কারণ তাওহিদ অনুসারীদের সামনে থাকে এক পরম ও অভীষ্ট লক্ষ, মহৎ উদ্দেশ্য—যার জন্য সে দুর্গম পথ অতিক্রম করছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার অপার সান্নিধ্য। তদুপরি তার থাকে সঠিক ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা যার উপর দিয়ে সে নির্বিঘ্নে পথ চলে ; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসূল সা. এর সুন্নত। সে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে পারংগমতার সাথে স্বীয় ব্রত পালন করে। এরশাদ হচ্ছে—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ. (الحجرات:١٣)

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার।'[৩] রাসূল সা. বলেন—

---

১ সূরা আন নাহল : ৯৭

২ সূরা ত্বাহা : ১২৪

৩ সূরা আল হুযুরাত : ১৩

إن الله لاينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা ও শরীর পর্যবেক্ষণ করেন না। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহ।'

৫. তাওহিদ মানে মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত ও স্বাধীন করা। কারণ তাওহিদ বা একত্ববাদ-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলার বশ্যতা, অধীনতা ও দীনতা স্বীকার করা। তার সৃষ্টি জীবের আনুগত্য ও পূজ্যতা পরিহার করা। তদুপরি তাওহিদ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তিকে বিশ্বজগৎ ও এর ভিতর সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু—জীব-উদ্ভিদ সম্পর্কে মুশরিক বা পৌত্তলিকদের আবিষ্কৃত-অনুসৃত কুসংস্কার ও বানোয়াট কল্প-কাহিনী হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করে। মানুষের চিত্ত ও চেতনাকে পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত সকলের সামনে হীনতা নীচতা ও আত্মসমর্পণ হতে বিরত রাখে। সর্বোপরি মানুষের জীবন চক্রকে সীমা-লঙ্ঘনে অভ্যস্ত, প্রভুত্বের দাবিদার ও নববী আহ্বানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের আধিপত্য হতে মুক্ত করে।

৬. তাওহিদ মানে ভারসাম্যপূর্ণ পরিশীলিত, পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব গঠন করা। কারণ তাওহিদ সৃষ্টি কুলের সামনে এমন এক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে—যা আল্লাহমুখী ও তার সন্তুষ্টির জিম্মাদার। তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মন-মস্তিষ্ক ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—যা তার অন্তরে প্রশান্তি, হৃদয়ে অবিচলতা ও আত্মায় অনাবিল সুখ সযত্নে নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে মূর্তিপূজকদের উপাস্য-হাজারো প্রভু তাদের অন্তরসমূহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বহুধা বিভক্ত করে রাখে। তারা সর্বদাই নানান পদ্ধতিতে তাদের উপাস্য-প্রভুদের সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকে। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ.-এর উপদেশ উল্লেখ করেন—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. (سورة يوسف:٣٩)

'হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'[১] অন্যত্র বলেন—

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (سورة الزمر:٢٩)

১ সূরা ইউসুফ : ৩৯

'আল্লাহ তাআলা এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : এক লোকের উপর বিরোধী ক'জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'[১]

৭. তাওহিদ আস্থাশীল দৃঢ় অন্তকরণ তৈরি করে। কারণ, তাওহিদ কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয় মানুষের অন্তকরণকে আল্লাহ তাআলার আস্থা ও তার উপর নির্ভরতা দ্বারা। সে তার নিঃসঙ্গতা ও গোপনীয়তায় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। যেহেতু সে জানে আল্লাহ তাআলা ছাড়া এ বিশ্ব পরিমণ্ডলে কেউ হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে না। কিংবা উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া মানবজাতি যাদের এবাদত-উপাসনা করে তারা স্বয়ং নিজেদের লাভ ক্ষতির যোগ্যতা রাখে না। অন্যদের কল্যাণ-অকল্যাণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তাআলার ওলীগণ নির্বিঘ্ন অন্তর ও আস্থাশীলতার অধিকারী হয়ে থাকেন, যার বাস্তব নমুনা আল্লাহ তাআলার নবী নূহ আ.। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছেন—

يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. (سورة يونس:٧١)

'হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান এবং আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসিহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরিকদেরকে সমবেত করে নাও। যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।'[২]

এর উত্তম নমুনা আল্লাহ তাআলার নবী ইব্রাহীম আ.। যখন তার সম্প্রদায় মূর্তি নিয়ে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে শাসাচ্ছিল ও ভীতি প্রদর্শন করছিল। তখন তিনি বলেছেন—

১ সূরা আয যুমার : ২৯

২ সূরা ইউনুস : ৭১

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. (سورة الأنعام:٨٠-٨٢)

'তোমরা যাদেরকে শরিক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না—তবে আমার পালনকর্তাই যদি ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করেন (তবে ভিন্ন কথা)। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না ? যাদেরকে তোমরা আল্লার তাআলার সাথে শরিক করে রেখেছ, তাদেরকে কীরূপে ভয় করব, অথচ তোমরা ভয় করোনা যে তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন বস্তুকে শরিক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক ? যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।'[১] আরো নমুনা নবী হুদ আ.। যখন তাকে বলা হয়েছিল—

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ. (سورة هود:٥٤)

'বরং আমরা তো বলি যে আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে।'[২] তিনি এর উত্তরে বলেনে—

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿سورة هود: ٥٤-٥٦﴾

'হুদ বললেন- আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ: তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিয়ো না। আমি আল্লাহ তাআলার উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি

১ সূরা আল আনআম : ৮০-৮২

২ সূরা হুদ : ৫৪

আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীণ নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।'[১]

দ্বিতীয়ত : পরকালীন সুফল : যার প্রধান প্রধান কতিপয় শুভ পরিণাম নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. তওহিদ মানে জান্নাতে প্রবেশাধিকার ও জাহান্নাম হতে মুক্তির নিশ্চয়তা :

যে তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করবে এবং যার নেকির পাল্লা গুনাহের পাল্লা হতে ভারী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরশাদ হচ্ছে-

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة الأعراف:٨)

'আর সে দিন যথার্থই ওজন করা হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।'[২]

তাওহীদের উপর মারা যাওয়ার পরেও যে ব্যক্তির গুনাহের পাল্লা ভারী হবে, সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। চাইলে নিরেট মেহেরবাণী দ্বারা তাকে মাফ করে দিতে পারেন। অথবা তারই অনুমতিতে কোন সন্তুষ্ট ভাজনের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। আর চাইলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন, যাতে সে গুনাহ থেকে পাক-সাফ হতে পারে। অতঃপর সে জাহান্নাম হতে বেরিয়ে আসবে। সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে না। বরং জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনুরূপ ভাষ্যই শাফায়াতের হাদিসে পাওয়া যায়। রাসূল সা. বলেন-

فأقول : يارب ائذن لي في من قال لاإله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، أو قال: ليس ذاك إليك- ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله.

"আমি বলব, হে আমার রব, যারা لاإله إلا الله বলেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ কাজ তোমার নয় বা তাদের ব্যাপার নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তবে আমার ইজ্জত, অহমিকা ও বড়ত্বের শপথ, যারা لاإله إلا الله বলেছে তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাব।

১ সূরা- হুদ : ৫৪-৫৬

২ সূরা আল আরাফ : ৮

তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক: শিরক মুশরিক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেয়। সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সে যত আমল সম্পাদন করুক তার কোনো কাজে আসবে না। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. (سورة المائدة:٧٢)

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[১] আয়েশা রা. এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন-

قلت يا رسول الله! ابن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: (لاينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغقر لي خطيئتي يوم الدين.)

'আমি বলেছি হে আল্লাহর রাসূল সা. ইবনে জাদআন ইসলাম পূর্বযুগে- জাহিলিয়াতে- আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতো, অভাব গ্রস্তদের খাদ্য প্রদান করতো, এর দ্বারা কি সে উপকৃত হবে? তিনি উত্তর দিলেন: এ আমলগুলো তাকে কোন উপকৃত করতে পারবে না। যেহেতু সে কোন দিন বলেনি, رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين (হে আমার রব! কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ মাফ কর।)

২.তাওহীদের বদৌলতে নেক কাজের মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা মিলে :

তাওহিদ দ্বীন বা ধর্মের মূল ভিত্তি এবং ঐ মূল স্তম্ভ যার উপর মিল্লাত বা ধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছে। যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তাওহিদ নিয়ে আসবে তার অন্যান্য আমলের মূল্যায়ন করা হবে। আর যে তাওহিদসহ আসতে পারবে না, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হবে এবং তা অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। এরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سورة الأنعام:٨٨)

'যদি তারা শিরক করে, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।'[২]

---

১ সূরা : আল মায়েদা ৭২

২ সূরা : আল আন আম : ৮৮

৩. তাওহীদের ফলে গুনাহ মাফ ও অপরাধ মোচন হয় :

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট নির্ভেজাল তাওহিদ ও শিরকের দূরতম সম্পর্ক মুক্ত খাটি আমল নিয়ে আসবে- তার সমস্ত পাপ মোচন করা হবে। তার সকল অপরাধ মাফ করা হবে। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসীতে বলেন-

يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة.

'হে আদম সন্তান তুমি যদি দুনিয়ার সমতুল্য পাত্রপূর্ণ অপরাধ নিয়ে আমার কাছে আস, অতঃপর আমার সঙ্গে কোন জিনিসকে শরীক করা থেকে মুক্ত হয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, আমি দুনিয়ার সমতুল্য পাত্রপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।'

তদ্রুপ সুসংবাদ এসেছে আমলনামা সংক্রান্ত হাদিসে, যে টিকেটে لاإله إلا الله. অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহিদ থাকবে সে টিকেটটি ওজনের পাল্লাতে গুনাহের নিরানব্বইটি নথিপত্রের উপর ভারী হবে। প্রত্যেকটি নথিপত্রের দৈর্ঘ্য হবে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত।

তাওহীদের প্রকার :

ওলামায়ে কেরাম তওহিদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন :

প্রথমত : আল্লাহ তাআলার সত্তা, তার কার্যাবলী, তার বিশেষ্য ও বিশেষণ সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করণ ও প্রতিপন্নকরণ। এ প্রকার তওহিদকে ওলামায়ে কেরাম নামকরণ করেছেন- توحيد المعرفة والإثبات হিসেবে। (অর্থ:আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করা। তার প্রতিনিধি হিসেবে তদীয় সমস্ত বিধানাবলী মননে ও শরীরে, নিজের ভিতর ও অন্যের ভিতর সফল রূপায়ণ ও যথার্থ বাস্তবায়ন করা।)

কতেক ওলামায়ে কেরাম এ প্রকার তওহিদকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন:

১. (توحيد الربوبية) তওহিদুর রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্ব ও প্রতিপালন সম্পর্কিত একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি প্রদান। তার প্রত্যক্ষ ও স্বনিয়ন্ত্রিত কর্মসমূহে একমাত্র তাকেই সম্পাদনকারী জ্ঞান করা। যেমন-রাজত্ব, পরিকল্পনা, সৃষ্টি, কল্যাণ-অকল্যাণ, রিজিক প্রদান, জীবিত করণ ও মৃত্যুদান ইত্যাদি

কর্মসমূহ আল্লাহ তাআলা পরিকল্পনা করেন এবং প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে একক সিদ্ধান্তে সম্পাদন করেন।

আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়: توحيد الربوبية দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা:

(এক) আসমান-জমিন, জিন-ইনসান, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, আলো-বাতাস, চন্দ্র-সূর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি জীব একমাত্র আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও প্রত্যক্ষ নির্দেশ (كن) এর মাধ্যমে সৃজিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কারো থেকে সামান্যতম সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। সৃষ্টির অণুপরিমাণ বস্তের সৃষ্টির ভিতর কারো অংশীদারিত্বও নেই।

(দুই) যাবতীয় সৃষ্টিজগত পরিচালনা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন প্রণয়ন, মুসলমান-মুসলমান, মুসলমান-অমুসলমান, অমুসলমান-অমুসলমান এর ভিতর সম্পর্ক-উন্নয়ন, সম্পর্ক-ছিন্নকরণ, লেন-দেন, উদারনীতি-কঠোরনীতি নির্নয় করণ, এবং এ সমস্ত জিনিসের প্রকৃতি ও ধরন ব্যাখ্যা করণ, এককমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার। এর বিরুদ্ধাচারন করে কেউ যদি নিজেকে আংশিক বা সামগ্রিক অধিকার সংরক্ষণকারী মনে করে- সে বাস্তবে রুবুবিয়্যাতের দাবীদার। কাফের। যেমন ফেরআউন, নমরূদ। আবার কেউ যদি এর সামগ্রিক বা আংশিক অধিকারের অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে, সে মুশরিক বা পৌত্তলিক। যেমন- মক্কার আবু জাহেল, আবু লাহাব ও বর্তমান যুগের পৌত্তলিক সম্প্রদায়। হোক না সে অংশিদারকৃত বস্তু সামাজিক সংঘঠন, রাষ্ট্রিয় পার্লামেন্ট কিংবা আন্ত র্জাতিক কোন সংস্থা।

সুতরাং একজন মুসলমানকে রব হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে মেনে নিতে হবে। তাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘোষণা করতে হবে: আল্লাহ তাআলাকে আমি রব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। ইসলামকে আমি ধর্ম বা জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সা.কে আমি নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। তাকে দৃঢ়চিত্তে আরো ঘোষণা দিতে হবে: আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি উভয় জাহানের পালনকর্তা।

এর পরেই সে প্রবেশ করবে শান্তির শামিয়ানায়। আরোহন করবে মুক্তির তরীতে। তাওহিদ তথা ইসলামের কিস্তিতে। অতঃপর বিশ্বাসের এ তরীকে অবিশ্বাসের প্রলয়ংকারী ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ ও সমূহ প্রতিকুলতা হতে হেফাজত করার

জন্য জীবন মরণ শপথ গ্রহণ করতে হবে। প্রশান্তচিত্ত, পূর্ণ বিশ্বাস, আর দৃঢ় আস্থা নিয়ে তাওহিদ তথা ইসলামের তরী বর্হিভূত সকল মানবজাতি: যারা শিরক-কুফর আর পথভ্রষ্টতার মহা সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, যারা নাজাতের এ তরীকে বিপদ সঙ্কুল, দূর্ভেদ্য দেয়ালঘেরা শাস্তি কুন্ড, মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী ভাসমান জেলখানা, আধুনিকতা বির্বজিত সেকেলে সভ্যতার বাহক সমুদ্র পিষ্ঠে এক প্রাচীন দীপ মনে করে আছে, তাদেরকে এ তরীতে উঠার উদাত্ত্ব আহবান জানাতে হবে। তবেই পরিগণিত হবে সে আল্লাহর সমীপে আত্নসমর্পনকারী পরিপূর্ণ মুসলমান। পরকালে বিশ্বাসী খাটি মুমিন।

২. (توحيد الأسماء والصفات) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সব সত্তাগত বা গুণগত (বিশেষ্য ও বিশেষণ মূলক) নামসমূহ নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অথবা রাসূল সা. যে সব সত্তাগত বা গুণগত (বিশেষ্য ও বিশেষণ মূলক) নামসমূহ আল্লাহর জন্য বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে কোন ধরনের রূপদান বা সামঞ্জস্য বিধান, অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি সাধন, কর্মহীনকরণ বা নিরর্থকরণ, দৃষ্টান্ত প্রদান বা সাদৃশ্য বর্ণনা ব্যতিরেকে বাস্তব সম্মত ও যথার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য উপযুক্ত মনে করা এবং সে হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয়ত : কথা, কাজ এবং নিয়্যত ও ইচ্ছার সমন্বিত এবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে উৎসর্গ করা। যেমন- মহব্বত, ভয়, আশা, মান্নত, কুরবানী, তওবা, নামায বা সালাত, রোজা বা সিয়াম সাধনা, যাকাত, হজ্ব...ইত্যাদি। এবাদত গুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য জ্ঞান করা। এটাই কালেমায়ে তাওহিদ لاإله إلا الله এর অর্থ ও আবেদন। এ প্রকার তাওহিদকে ওলামায়ে কেরাম নামকরণ করেছেন (توحيد القصد والطلب) বলে। (অর্থ:একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে চাওয়া এবং এবাদতের মাধ্যমে শুধু তাকে পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা।)

আল্লাহ তাআলা এ প্রকার তাওহিদসহ রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং এর জন্য আসমান হতে কিতাব নাজিল করেছেন। তবে রাসূলগন এবং তাদের দাওয়াতী সম্প্রদায়ের মাঝে তাওহীদের প্রথম প্রকার নিয়ে কোন বিবাদ, সংঘাত বা দ্বন্ধ ছিল না। কারণ এ প্রকার তাওহিদ তারা স্বীকার করতো, অস্বীকার করতো না। উদাহরণত ঐ সমস্ত মুশরেকগণ যাদের নিকট দাওয়াতের জন্য রাসূল সা.কে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা বিশ্বাস করতো- আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, জীবন

দানকারী, মৃত্যু প্রদানকারী, সার্বিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন- পবিত্র কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

১.এরশাদ হচ্ছে-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ سورة الزخرف : ٨٧﴾

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।'[১]

২.আরো এরশাদ হচ্ছে-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ. (سورة العنكبوت: ٦٣)

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ!'[২]

৩.আরো এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. (سورة يونس:٣١)

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযীদান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন? এবং কে মৃতকে জীবিতের মধ্য হতে থেকে বের করেন? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?।'[৩]

হ্যাঁ, ঝগড়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল:توحيد القصد والطلب (অর্থ:একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে চাওয়া এবং এবাদতের মাধ্যমে শুধু তাকে পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা।) অর্থাৎ এক উপাস্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে, শুধু আল্লাহর জন্য এবাদত

১ সূরা যুখরুফ : ৮৭।

২ সূরা : আল আনকাবুত- ৬৩

৩ সূরা : ইউনুস-৩১

সীমিত করনের ভিতর এবং لا إله إلا الله এর সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা নিয়েই মূল ঝগড়া। আল্লাহ তাআলা আরবের কাফেরদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছে:

أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ سورة ص : ٥-٧﴿

'সে কি বহু উপাস্যের পরির্বতে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পুজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয় এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়।'[১] আরো এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ سورة الصفت : ٣٥-٣٦﴿

'তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?'[২]

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ سورة نوح : ٢٣﴿

'তারা বলেছে : তোমরা তোমদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।'[৩]

বরং কুরআনের ভাষানুযায়ী বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এ প্রকার তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য রাসূলদের স্ব স্ব সম্প্রদায় ও কওমের নিকট প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ﴾ سورة النحل : ٣٦﴿

---

১ সূরা : সাদ- ৫-৭

২ সূরা : সাফফাত : ৩৫-৩৬

৩ সূরা নূহ : ২৩।

'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরন করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।' (আন নাহল:৬৩)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿الأنبياء : ٢٥﴾

'আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশেই প্রেরণ করেছি যে আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । সুতরাং আমারই এবাদত কর।'[১]

তবে অবশ্যই পরকালের নাজাতের জন্য উভয় তাওহীদের বাস্তবায়ন করতে ও মানতে হবে। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রথম প্রকার তাওহিদ (توحيد المعرفة والإثبات) নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় প্রকার তাওহিদ (توحيد القصد والطلب) পরিত্যাগ করবে -যা অধিকাংশ মুশরিকদের অবস্থা- সে কোনো ভাবেই উপকৃত হবে না। এ তাওহিদ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। পবিত্র কুরআন তাদের কাফের ঘোষণা করেছে এবং শিরকের দ্বারা বিশেষায়িত করেছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾. (سورة يوسف:١٠٦)

'অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরক করে।'[২]

অত্র আয়াতে ঈমান গ্রহণের অর্থ- আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, জীবন দানকারী, মৃত্যুদান কারী, বিশ্বজাহানের মালিক ও পরিকল্পনাকারীর উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। শিরক করার অর্থ: এবাদতের ভিতর আল্লাহ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করা। একটি উদাহরণ- মক্কার মুশরিকগণ কা'বা ঘরের তওয়াফ করার সময় তালবিয়ার ভিতর বলতো:

لبيك لاشريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

'হে আল্লাহ ! আমি উপস্থিত। তোমার কোনো অংশীদার নেই। তবে যে সমস্ত অংশিদারগণ একমাত্র তোমারই জন্য- তারা ছাড়া । যাদের মালিক তুমি এবং তাদের মালিকাধীন জিনিসের মালিক ও তুমি।'

তাওহীদের উপর একটি পর্যালোচনা

---

১ সূরা : আম্বিয়া- ২৫

২ সূরা : ইউসুফ-১০৬

১. তওহিদ তাওক্বীফী বা ওহীর উপর নির্ভরশীল : বান্দা হিসেবে আমরা যখনই তওহিদ নিয়ে পর্যালোচনা করবো, আল্লাহ তাআলা ও তার রসূলের বর্ণনাকৃত নির্ধারিত সীমা রেখার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবো। কারণ এখানে বাড়ানো-কমানো, বিকৃতকরণ ও পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। শুধুমাত্র কুরআনুল কারীম ও নির্ভরযোগ্য সনদে প্রাপ্ত হাদীস হতেই তাওহিদ গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সা. তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির তাওহিদ নিয়ে যে কোনো মন্তব্য করার অধিকার নেই। তদুপরি কুরআন বা হাদীস বুঝার জন্য কুরআনের অপর আয়াত বা অপর আরেকটি হাদীসের - যেখানে আলোচিত আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে- শরাণাপন্ন হতে হবে। সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও আদর্শ পূর্বসুরীগণের ইলম ও ব্যাখ্যার দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে।

যেহেতু তাওহিদ ওহী নির্ভর, যেখানে যুক্তি, অনুমান বা কল্পনার বিন্ধুমাত্র দখল নেই। সেহেতু তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করার গুরুত্ব ও শিক্ষা দেয়ার অপরিহার্যতা সহজেই অনুমেয় ও বোধগম্য। এও সুস্পষ্ট যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ওহী ব্যতীত তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প নেই। কারণ মানুষ যদি না জানে তাওহীদের দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তাহলে সে কিভাবে তাওহিদবাদী বা একত্ববাদী হবে?

২. তাওহীদকে তার সার্বজননীতা ও ব্যাপকতা সহকারে গ্রহণ করতে হবে :

রাসূল সা.দের উভয় প্রকার তাওহিদ অর্থাৎ توحيد المعرفة والإثبات এবং توحيد القصد والطلب। সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে। উভয় প্রকার গ্রহণ করা ছাড়া কোন বান্দার ভিতর তাওহিদ পূর্ণতা পাবে না। কিন্তু বাস্তব ময়দানে আমরা যখন আলেমদের ও দ্বীনের পথে আহবান কারীদের প্রতি দৃষ্টি দেই, সুস্পষ্ট ক্রুটি ও ফাটল দেখতে পাই। কেউ কেউ তাওহীদের কোনো এক প্রকারে গুরুত্বারোপ করে অপর প্রকারকে গুরুত্বহীন রেখে দিয়েছে।

কতিপয় লোকের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাওহীদের কিয়দাংশ তাওহিদ থেকে বের করে দিয়ে তাওহীদের অঙ্গহানী করেছে। বরং যে অন্যদের পরিত্যাগকৃত তাওহীদের অংশকে শিক্ষা দেয় তাকে তারা বেদ'আতের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে পরিত্যাগকৃত অংশ তাওহীদের অর্ন্তভূক্ত নয়।

উদাহরণ স্বরূপ: কেউ কেউ মনে করে আছেন- নিয়ত ও এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে কামনা করাই হল মূল তাওহিদ। যেমন- আল্লাহ তাআলা জন্য কুরবানী করা, শুধু তার নামেই শপথ করা, তার জন্য মান্নত করা এবং তার কাছে

দোয়া করা। তারা তাওহীদের বাকি অংশকে হিসেবে আনে না, কখনো আনলে তেমন গুরুত্ব দেয় না। যেমন- ফয়সালার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকট তথা কুরআনের শরনাপন্ন হওয়া। তাগুতের মীমাংসার সমাধান কামনা না করা।

কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের তাওহিদ এবং মীমাংসার জন্য একমাত্র তার শরণাপন্ন হওয়ার তাওহিদে গুরুত্ব প্রদান করেন। তাওহীদের অন্যান্য প্রকারকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। যেমন- একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করা, মান্নত করলে তাঁর জন্য করা, তার নামে শপথ করা, পূর্ণ অর্থবোথক, সুন্দর সুন্দর বিশেষ্য ও বিশেষণ মূলক নামসমূহকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট করা।

উল্লেখিত সকল গ্রুপেই তাওহিদ বুঝার ক্ষেত্রে ভুল আছে। কারণ তারা তাওহিদকে যে ভাবে বুঝেছে তাওহিদ তার চেয়ে ব্যাপক ও ব্যাপকতর। যে তাওহীদের কোনো এক প্রকারে ভুল করল সে মূল বিষয়ে ভুল করল। এরশাদ হচ্ছে–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ . (سورة البقرة:٨٥)

'তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছেঁ দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্ক বেখবর নন।'[১]

উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ দল, কোন আলেম অথবা দ্বীনের প্রতি আহবানকারীদের প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করা হচ্ছেনা। বরং অভিযোগ হল তাদের বিরুদ্ধে যাদের মধ্যে রয়েছে গুরুত্ব প্রদানকৃত অংশে তাওহিদকে সীমাবদ্ধ করন এবং তাওহীদের অপর অংশের ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা প্রদর্শন এবং যারা অপর অংশের প্রতি গুরুত্ব দেয় তাদেরকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও বিকৃত অভিযোগে অভিযুক্ত করা।

৩. তাওহীদের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয় : অধিকাংশ মানুষের নিকট তাওহীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান এখন আর অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট নয়। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে

১ সূরা : বাক্বারা-৮৫

ইহা জরুরীও বটে । কিন্তু এতটুকু তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বরং সে তাত্ত্বিক জ্ঞানানুযায়ী অনুপ্রাণীত হওয়া, তার কাছে আত্মসম্পর্ণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য।

যেমন আল্লাহ তাআলা রিযিক দাতা, সুসংহত সুদৃঢ় ক্ষমতার অধিকার- শুধু এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে আভ্যন্তরীন সক্রিয়া অনুভুতির প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ তাকদীরের উপর বিশ্বাস করত হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জিনিসের জন্য বিষন্ন না হওয়া। নাজায়েয বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টা না করা। ধর্মীয় দায় দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্যে আপাদ-মস্তক আত্মনিয়োগ না করা। হালাল ও বৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত্ব পন্থা ও পদ্ধতিকে অবহেলা কিংবা পরিত্যাগ না করা।

কালেমায়ে শাহাদাত : অর্থ, শর্তাবলী, লঙ্ঘন ও বিরুদ্ধাচরণ

ইসলামের গোড়া পত্তন হয়েছে শিরকের কলঙ্ক ও পৌত্তলিকতার নোংড়ামী মুক্ত খাঁটি, নির্ভেজাল তাওহিদ তথা একত্ববাদের উপর। যার রূপকার لاإله إلا الله ও محمد رسول الله এর শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান।

لاإله إلا الله এর শাহাদাতের উদ্দেশ্য: বিনয়-নম্র ভাবে নিজেকে আল্লাহর সমীপে সপে দেয়া, তার বশ্যতা মেনে নেয়া। তিনি এক তার কোন শরীক নেই, এটা ঘোষণা দেয়া।

محمد رسول الله এর শাহদাতের উদ্দেশ্য: নিজেকে সপে দেয়ার পদ্ধতি ও এবাদতের বিশদ বর্ণনা মুহাম্মদ সা. এর নিকট হতে গ্রহণ করা। উভয় শাহাদাতের মৌখিক উচ্চারণ ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামকে আলিঙ্গন করার বহিঃপ্রকাশ।

ক্বিয়ামতের দিন দুইটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করতে পারবে না।

প্রথম প্রশ্ন : তোমরা কার এবাদত করতে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : রসূল সা.কে কি জাওয়াব দিয়েছ ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : ইলম তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আমলের মাধ্যমে لاإله إلا الله এর বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর: ইলম তথা রসূল সা. এর পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আনুগত্যের মাধ্যমে محمد رسول الله এর বাস্তবায়ন।

لاإله إلا الله এর সাক্ষ্য প্রদানের তাৎপর্য :

সংবেদনশীল, তাৎপর্যপূর্ণ এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল: ‘সত্যিকারার্থে আল্লাহ ছাড়া কেউ এবাদতের উপযুক্ত নয়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি, রিযিকদাতা, কল্যাণ সাধনকারী, ক্ষতিসাধনকারী ও পরিচালনাকারী, সেহেতু আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য বান্দা স্বীয় নিবেদন, আশা, ভয়, মহব্বত, মীমাংসা, ভরসা এবং সমস্ত কর্মকান্ডের ব্যাপারে একমাত্র তার শরণাপন্ন হবে, অন্য কারো নয়।

শাহাদাতের মূল ভিত্তি :

শাহাদাত বা لاإله إلا الله এর সাক্ষ্য মূল দুইটি ভিত্তির উপর নির্ভরশীল—

১. প্রত্যাখ্যান।

২. স্বীকৃতি প্রদান।

لاإله : প্রত্যাখ্যান। অর্থাৎ এবাদতের উপযুক্ত যে কোনো উপাস্যের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করা, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত।

إلا الله : স্বীকৃতি প্রদান। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এবাদতের উপযুক্ত অন্য কেউ নয়, এর স্বীকৃতি প্রদান করা।

لاإله إلا الله এর শর্ত সমূহ :

আলোচিত কালেমায়ে তাওহিদ জান্নাতে প্রবেশের চাবি স্বরূপ, জাহান্নাম তাতে মুক্তির ঢাল স্বরূপ। এরশাদ হচ্ছে-

من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة.

"যে لاإله إلا الله (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই) এর অর্থ, তাৎপর্যের জ্ঞান নিয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

রসূল সা. আরো বলেন-

إن الله حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.

"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে لاإله إلا الله কালিমাটি পাঠ করেছে।"

আফসোস! অনেক মানুষ কালেমায়ে শাহাদাত শুধু মুখে উচ্চারণ করে পরমানন্দে নিশ্চিন্ত বসে আছে, অথচ এর শর্ত, এর দাবী বাস্তবায়ন যে কত অপরিহার্য তা একেবারে বেমালুম ভুলে আছে। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.কে প্রশ্ন কর হয়েছিল,

أليس لاإله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لن يفتح لك.

لاإلـه إلا الله কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি উত্তর দিলেন- অবশ্যই। তবে প্রতিটি চাবির কিন্তু দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁত আছে এমন চাবি নিয়ে আস, তোমাকে দরজা খুলে দেয়া হবে। অন্যথায় দরজা খুলে দেয়া হবে না।

কতেক প্রজ্ঞাময় ওলামায়ে কেরাম নিম্নের পংতির মাধ্যমে لاإلـه إلا الله এর শর্তগুলো একত্রিত করে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

علم يقين وإخلاص وصدقك محبة وانقياد والقبول لها.

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها.

১.ইলম।
২.দৃঢ় বিশ্বাস।
৩.ইখলাছ।
৪.সততা আন্তরিকতা।
৫.ভালবাসা।
৬.আত্মসমর্পণ।
৭. لاإله إلا الله কে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।
৮. আল্লাহর বিপরীতে উপাস্য সকল মূর্তি পত্যাখ্যান করা।

আটটি মূল ভিত্তির উপর সামান্য আলোকপাত :

১. এই কালেমার অর্থ, আবেদন ও দাবী সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করা, অজ্ঞতা পরিহার করা :

বান্দাকে অবশ্যই জানতে হবে لاإلـه إلا الله (প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ) অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতি দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। এই কালিমার দাবি হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া যে কোন জিনিসের এবাদতের উপযুক্ততা প্রত্যাখ্যান করা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা। এরশাদ হচ্ছে-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. (سورة محمد:١٩)

‘জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্যে।’[১] রসূল সা. বলেছেন-

১ সূরা : মুহাম্মদ-১৯

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.

'যে ব্যক্তি لاإلـه إلا الله এর তাৎপর্য ও অর্থ জানাবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

২. এই কালেমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, সংশয়-সন্দেহ পরিত্যাগ করা:

لاإلـه إلا الله এর অর্থ ও তাৎপর্যকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করার মানে, এর ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয়, সন্দেহ বা কিংকর্তব্য বিমূঢ়তার বিন্ধুমাত্র শংমিশ্রন থাকতে পারবে না। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾. (سورة الحجرات:١٥)

'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।'[১] রসূল সা. আবূ হুরায়াকে বলেন,

يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين- وأعطاه نعليه- فمن لقيت من وراء هذاالحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.

'হে আবূ হুরায়রা! তুমি আমার এ দু'টি জুতো নিয়ে যাও- তাকে জুতো দু'টি প্রদান করলেন- এ দেয়ালের ওপাশে অন্তরের অন্তস্থল হতে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে لاإلـه إلا الله এর সাক্ষ্য প্রদানকারী যার সাথেই তুমি সাক্ষাত করবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।'

৩. এই কালেমার আবেদন ও দাবী স্বতঃস্ফুর্ত গ্রহণ করা, প্রত্যাখ্যান না করা :

অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে এই কালেমার আবেদন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি এই কালেমার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করবে, আন্তরিক ভাবে মেনে না নিবে সে কাফের। সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে অহংকার, বিরোধিতা, হিংসা, বাপ-দাদার অন্ধানুকরণ ইত্যাদি কারণে। যেমন পবিত্র কুরআনের ভাষায় অহংকার বশত لاإلـه إلا الله এর অর্থ ও তাৎপর্যকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ সম্পর্কে হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : আল হুযুরাত-১৫

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ سورة الصافات:٣٥-٣٦﴿

"তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?"[১]

অতীত উম্মতের ভিতর যারা এই কালেমার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে, আন্ত রিক ভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের থেকে নেয়া প্রতিশোধ চিত্র পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾. (سورة الزخرف:٢٣-٢٥)

'এমনি ভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদেরই বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলি। সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে, তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতঃপর দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।'[২]

৪. এই কালেমার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, পরিত্যক্ত করে না রাখা:

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ, আভ্যন্তরিণ মননশীলতার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কালিমার অর্থ, আবেদন ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া। যার সত্যতা প্রমাণিত হবে, আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন, তার পছন্দনীয় বস্তুগুলো গ্রহণ, অপছন্দনীয় বস্তুগুলো বর্জন এবং তার গোস্বা ও রাগান্বিত বিষয়-বস্তুগুলো পরিহার করার মাধ্যমে। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সাফফাত:৩৫-৩৬।

২ সূরা : আয যুখরুফ- ২৩-২৫

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. (سورة لقمان:٢٢-٢٣)

'যে ব্যক্তি সৎকর্ম পরায়ন হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল। যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে ক্লিষ্ট না করে।'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾. (سورة النساء:٦٥)

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না নেয়, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে।'[২] রসূল সা. বলেছেন-

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

'তোমাদের কেউ মুমিন বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আনীত বিধানের প্রতি তার প্রবৃত্তি আনুগত্য প্রকাশ না করবে।'

৫. এই কালেমার ব্যাপারে নিরেট সততা প্রর্দশন করা, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার করা :

বান্দার অন্তরে সুপ্ত অভিব্যক্তির সাথে মুখের উচ্চারণের এতটুকু সমন্বয় থাকতে হবে, যার দ্বারা তার অবস্থা মুনাফিক তথা কপটদের অবস্থা হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়- যারা মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নিয়ে মুখে এমন সব কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে না। এরশাদ হচ্ছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾. (سورة البقرة:٨-١٠)

---

১ সূরা : লুকমান-২২-২৩

২ সূরা : নিসা- ৬৪

'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এর দ্বারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।'[১]

রসূল সা. বলেছেন:

ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.

'যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে لاإلـه إلا الله এর সাক্ষ্য প্রদান করবে তার উপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।'

৬. এই কালেমার প্রতি খাঁটি মহব্বত প্রদর্শন করা, বিদ্বেষ পোষণ না করা :

এই কালিমা ও তার আবেদনের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও মহব্বত রাখা। অর্থাৎ এই কালেমা অনুযায়ী আমল পছন্দ করা, যারা এর উপর আমল করে এবং এর প্রতি আহবান করে তাদের মহব্বত করা। যারা এই কালেমাকে অপছন্দ করে এর সাথে প্রতারণা বা মিথ্যারোপ করে, এর থেকে পৃষ্ঠপ্রর্দশন করে ও এর প্রচার প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদেরকে অপছন্দ ও প্রতিহত করা। এই কালেমার প্রতি মহব্বতের প্রমাণ দেয়ার জন্য আরো প্রয়োজন- আল্লাহ তাআলার আদেশকৃত ও পছন্দনীয় জিনিসগুলো বাস্তবায়ন করা, যদিও তা প্রবৃত্তির বিপরীত হয়। অপরপক্ষে আল্লাহ তাআলার নিষেধকৃত ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তা হতে দূরে থাকা, যদিও তার প্রতি অন্তর ধাবিত হয়। আল্লাহর বান্দাদের সাথে সর্ম্পক স্থাপন করা। আল্লাহর শত্রুদের সাথে সর্ম্পকচ্ছেদ করা। রসূলের অনুকরণ করা। তার দিক নির্দেশনার অনুসরণ করা। তার আনীত বিধানকে কবুল করা। এ ছাড়া মহব্বত শুধু একটি দাবী যার কোন বাস্তবতা নেই। এরশাদ হচ্ছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ.

(سورة البقرة:١٦٥)

'আর কোন লোক এমন রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং এদের প্রতি এমন ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে

১ সূরা : আল বাক্বারা-৮-১০

থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।'[১]

অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহিদ তাদের অন্তরে ও হৃদয়ে স্থায়ীরূপ নিয়েছে। তাদের অন্তর ও হৃদয় এ কালেমা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, বিধায় অন্য কোনো জিনিসের জন্য তাদের অন্তর উন্মুক্ত হয় না। তাদের অন্তরে যত মহব্বত-বিদ্বেষ দেখা যায় সব এই কালেমার অনুকরণে উৎসারিত হয়।

৭. এই কালেমার প্রতি পূর্ণ এখলাস প্রদর্শন করা, লৌকিকতা, সুখ্যাতি ও অংশিদারিত্ব পরিহার করা :

সমস্ত এবাদতে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশন করা। ছোট বড় সমস্ত শিরক হতে নিয়্যত পরিশুদ্ধ রাখা। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾. (سورة البينة:٥)

'তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ট ভাবে আল্লাহ তাআলার এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।'[২] রসূল সা. বলেছেন-

إن الله حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل.

'আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য لاإله إلا الله বলেছে।'

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه– أنه قال: قلت يارسول الله من أسعد الناس لشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أباهريرة أن لايسألني عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصا من قبل نفسه.

'আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত: তিনি বলেন আমি বলেছি হে আল্লাহর রসূল সা. কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশের মাধ্যমে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা, আমি নিশ্চিতভাবে ধারণা করেছিলাম যে, এ

১ সূরা : আল বাক্বারা-১৬৫

২ সূরা : আল বায়্যিনাহ-৫

ব্যাপারে তোমার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। যেহেতু হাদিসের প্রতি তোমার অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। (শুন!) কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত বা সুপারিশ দ্বারা ঐ ব্যক্তি বেশী লাভবান হবে যে অন্তরের অন্তস্থল হতে নিবিষ্ট চিত্তে لاإله إلا الله বলেছে।'

৮. আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যদের অস্বীকার করা :

বান্দার উচিত আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ধারণা প্রসূত সকল উপাস্য-মা'বূদ অস্বীকার করা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় করা যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ছাড়া যাদের এবাদত করা হচ্ছে সব অসাড়। যে কেউ এ সমস্ত কাজ করে সে আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে, হোক না সে উপাস্য (মা'বুদ) নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তা, প্রেরিত রসূল, নেককার ওলী, পাথর, গাছ, চন্দ্র, দল, গোষ্টি-জ্ঞাতি, অথবা কোন সংবিধান...ইত্যাদি। এরশাদ হচ্ছে-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾. (سورة البقرة:٢٥٦)

'যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ করে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।'[১]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. (سورة النحل.٣٦)

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।'[২] রসূল সা.বলেছেন-

من قال لاإله إلاالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل.

'যে لاإله إلا الله বলেছে এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করেছে তার সম্পদ ও জীবন হারাম হয়ে গেছে এবং তার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।'

হে মুসলিম ভাই! তুমি ভাল করে জেনে নাও: জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করা, জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া এ কালেমার উপর অটল, অবিরাম অবিচল থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা ব্যতিত সম্ভব নয়। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : আল বাক্বারা-২৫৬

২ সূরা : আন নাহল- ৩৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾. (سورة آل عمران:١٠٢)

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমন ভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।'[১] রসূল সা. বলেছেন:—

من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة.

'আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক না করে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' অন্যত্র বলেন-

ما من عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة.

'যে ব্যক্তি لاإله إلا الله বলেছে অতঃপর এর উপর স্থির থেকে মারা গিয়েছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই কালেমা ভিন্ন অন্য কোন নীতির উপর স্থির থেকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে এবং শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. (سورة النساء:٤٨)

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ- যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।'[২] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾. (سورة المائدة:٧٢)

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে অংশিদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম। অত্যাচারিদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[৩] রসূল সা. বলেছেন-

---

১ সূরা : আলে ইমরান-১০২

২ সূরা : নিসা-৪৮

৩ সূরা : আল মায়েদা-৭২

من لقي الله لايشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.

'যে শিরক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শিরকে জড়িত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

محمد رسول الله এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ :

محمد رسول الله এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ: মৌখিক ভাবে স্বীকৃতির সাথে সাথে অন্তরে অবিচল, অটল ও অগাধ বিশ্বাস রাখা যে, তাদের নিকট আল্লাহর রেসালত বা বাণী পৌঁছানোর জন্য মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ দায়িত্ব প্রাপ্ত, রসূল। এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. (سورة الأعراف:١٥٨)

'বলে দাও, হে সকল মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴿سورة محمد : ٢٩﴾

'মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।'[২] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾. (سورة الفرقان:١)

'পরম করুনাময় তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।'[৩]

'আল্লাহ তাআলা তাকে শিরকসহ সমস্ত অপসন্দ-পরিত্যাজ্য কার্যকলাপ হতে ভীতি প্রর্দশনকারী, নির্ভেজাল তাওহিদসহ সমস্ত পছন্দনীয়-গ্রহণীয় কার্যকলাপের দিকে আহবানকারী রূপে প্রেরণ করেছেন।' এরশাদ হচ্ছে-

قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾. (سورة المدثر:٢-٣)

'উঠুন সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মহত্ব ঘোষণা করুন।'[৪]

১ সূরা : আরাফ-১৫৮

২ সূরা : মুহাম্মদ:২৯।

৩ সূরা : আল ফুরকান-১

৪ সূরা : আল মুদ্দাস্‌সির-২-৩

অর্থাৎ তাদেরকে শিরক হতে এবং মূর্তি পূজা হতে ও আল্লাহ কর্তৃক সমস্ত অস্বীকৃতির জিনিস হতে ভীতি প্রর্দশন করুন। তাওহিদ ও আল্লাহর অনুমোদিত বিধান মতে তার বড়ত্ব বর্ণনা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. (الفاطر:٢٤)

'আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।'[১]

অর্থাৎ আমি তাকে তওহীদ, আনুগত্য ও অধিক সওয়াবের সুসংবাদ দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি সাথে সাথে শিরক, গুণাহ ও কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শকও করেছি। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এখানেই যথেষ্ট করতে বলেছেন। এর পর কে মানলো আর কে মানলো না এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাবাদ করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ . (سورة المائدة:٦٧)

'হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না।'[২] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. (سورة المائدة: ٩٩)

'রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া।'[৩]

তিনি আমৃত্যু তার উপর প্রেরিত ওহী সংযোজন-বিয়োজন ব্যতীত হুবহু আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। যার আদিষ্ট হয়েছেন তা পঙ্খানুপুঙ্খু আদায় করেছেন। উম্মতের কল্যাণ কামনার সর্বশেষ উদাহরণটুকু পেশ করেছেন। এ জন্য আয়েশা রা. বলেছেন-

من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب. ولوكان كاتما شيئا لكتم عبس وتولى. ليس لك من الأمر شيئ.

১ সূরা : ফাতের-২৪

২ সূরা : আল মায়েদা- ৬৭

৩ সূরা : আল মায়েদা-৯৯

‘যদি কেউ তোমাকে বলে, মুহাম্মদ ওহীর কিয়দাংশ গোপন করেছেন, সে মিথ্যুক। কারণ যদি রসূল সা. কোন জিনিস গোপন করতেন, তাহলে অবশ্যই অত্র আয়াত দু’টি গোপন করতেন :

(১) عَبَسَ وَتَوَلَّى (عبس: ١) ‘তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।’[১]

(২) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (سورة آل عمران: ١٢٨) ‘এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই।’[২]

রসূল সা. আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা পৌঁছিয়েছেন তাই সম্পূর্ণ দ্বীন। কোনো ধরনের কমতি রাখেননি, যেখানে সংযোজন প্রয়োজন হবে। কোন ধরণের জটিলতা রাখেননি, যা দূরভীত করতে হবে। আবার এমনো সংক্ষিপ্ত সাড় করেননি, যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। এরশাদ হচ্ছে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. (سورة المائدة: ٣)

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[৩] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. (سورة النحل:٨٩)

‘আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা।’[৪]

অতএব যে কোন ব্যক্তির এতে সংযোজন বিয়োজন বা পরিবর্তনের সুযোগ নেই। এ ঘোষণা শুনার পর যদি কেউ তাতে কোন রকম পরিবর্তন করে, তবে পরিবর্তনকারীর উপর এর পাপ বর্তাবে। আল্লাহ তাকে সময় মত পাকড়াও করবেন।

১ সূরা : আবাসা-১

২ সূরা : ইমরান-১২৮

৩ সূরা : আল মায়েদা-৩

৪ সূরা : আন নাহল-৮৯

محمد رسول الله এর সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক শর্তসমূহ:

যে কোন বান্দার محمد رسول الله এর সাক্ষ্য প্রদান করার ফলে কয়েকটি জিনিস অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। তন্মেধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ হলো :

১. ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে অতীত ও ভবিষ্যত সংক্রান্ত যে সব সংবাদ রসূল সা. দিয়েছেন সে ব্যাপারে সত্যারোপ করা। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. (الحشر:١٤٧)

' রসূল সা. তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর।'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سورة الأنعام : ١٤٧﴾

'যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন- তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুনার মালিক। তার শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না।'[২]

২. রসূল সা. এর আদেশ পালন করে ও নিষেধ হতে বিরত থেকে যথাযথ তার অনুসরণ করার প্রমাণ দেয়া। এরশাদ হচ্ছে–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَّ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ سورة النساء : ٨٠﴾

'যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমূখতা অবলম্বন করল, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মদ) তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠাইনি।'[৩] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ سورة الجن : ٢٣﴾

'যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।'[৪]

৩. একমাত্র তার আনুগত্য করা অন্য কারো পথ বা পদ্ধতির অনুকরণে না চলা। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : আল হাশর-৭

২ সূরা : আল আন আম-১৪৭

৩ সূরা : নিসা-৮০

৪ সূরা : জিন-২৩

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ سورة آل عمران:٨٥﴾

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে, কস্মিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'[১] রসূল সা. বলেছেন:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

'যে এমন আমল করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত।' অন্যত্র বলেন-

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن أبى يارسول الله ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.

'আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যতীত। তারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল সা. প্রত্যাখ্যানকারী কে? তিনি বললেন, যে আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে অবাধ্য হবে সেই প্রত্যাখ্যানকারী।'

৪. পরিপূর্ণ রূপে রসূল সা. এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। এরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَّ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ كَثِيرًا ﴿ سورة الأحزاب:٢١﴾

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।'[২]

এতে সন্দেহ নেই যে রসূল সা. ইসলামের জীবিত নমুনা। প্রতিটি কাজে ও কর্মে তিনিই উত্তম পথিকৃত। যে তার আনুগত্য করবে সৌভাগ্যশীল হবে। যে তার আদর্শ ও নীতি হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত হবে।

৫. সমস্ত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে রসূল সা. এর মীমাংসার শরনাপন্ন হওয়া, সে মীমাংসাতে সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাথে ন্যায় ও ইনসাফের বিশ্বাস রাখা। এরশাদ হচ্ছে-

১ সূরা : আলে ইমরান-৮৫

২ সূরা : আল আহযাব-২১

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ سورة النساء : ٦٥﴾

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না নেয়। তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে।'[১]

৬. রসূল সা. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হওয়া এবং অবজ্ঞা ও অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা : আল্লাহ যতটুকু সম্মান দান করেছেন, ততটুকু সম্মান তাকে প্রদান করা। ইশাদ হচ্ছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (سورة الأحزاب:٤٠)

'মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।'[২]

সুতরাং এমন কোন ধারনা পোষণ করবে না যা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে শিরকের শামিল। যেমন- রসুল সা. এর জন্য আল্লাহর ন্যায় কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে এমন বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন- তিনি গায়েব জানেন, দুনিয়ার আবর্তন ও বিবর্তনের অধিকার রাখেন, উপকার ও ক্ষতি করার সামর্থ রাখেন, কিছু দিতে পারেন, বঞ্চিত করতে পারেন ইত্যাদি।

অথবা এমন বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না, যা আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সাথে শিরকের শামিল, যেমন- কুরবানী, মান্নত, সাহায্যের আবেদন, সুপারিশ প্রার্থনা, ভরসা, ভয় ও আশা ইত্যাদির ব্যাপারে তার শরনাপন্ন হওয়া। উল্লিখিত যাবতীয় এবাদত একমাত্র আল্লা্হ তাআলার জন্য। যে নবী সা. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে সে প্রকারন্তরে তার বিরোধীতায় ও অবধ্যতায় লিপ্ত হবে। যেমন তিনি বলেছেন-

لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.

'তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসার ব্যাপারে করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তার বান্দা এবং রসূল বলো।' যেহেতু আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, কতিপয় লোক

---

১ সূরা : আন নিসা-৬৫

২ সূরা : আল আহযাব-৪০

রসূল সা.কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। তাই তিনি উম্মতকে স্বীয় সাধ্য ও সামর্থ্যের কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. (الأنعام:٥٠)

'আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তা ছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেস্তা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরন করি, যা আমার কাছে আসে।'[১]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾. (سورة الأعراف:١٨٨)

'আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান, আর আমি যদি গায়েবের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতাম এবং কোন অমঙ্গল আমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো শুধু মাত্র ঈমানরদের জন্য একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা।'[২] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ سورة الجن:٢١-٢٣﴾

'বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি কিংবা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি না। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তার রসূলের অমান্য করবে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।'[৩]

---

১ সূরা : আল আন আম-৫০

২ সূরা : আল আরাফ- ১৮৮

৩ সূরা : জিন:২২-২৩

তদ্রুপ তাকে ঐ সমস্ত বৈশিষ্টহীন মনে করা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে ভুষিত করেছেন, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, রেসালাতের দায়িত্ব, সুসংবাদদান ও সতর্করণের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা স্বীয় নবুয়্যতের সত্যতা প্রমান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কতিপয় অদৃশ্য জ্ঞানের ইলম এবং হাওযে কাউসার প্রভৃতি দান করেছেন। এ সকল নেয়ামত ও পুরুস্কারের প্রতি বিশ্বাস রাখা, অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন হতে- যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দুনিয়া-আখেরাতে ধ্বংসের ঘাটে নিয়ে যাবে- বিরত থাকা।

এখানে আমরা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তার রসূল সা.কে প্রদত্ত্ব কতিপয় স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করছি, যা পূর্বের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। যার ব্যাপারে রসূল সা. স্বয়ং বলেছেন, এরশাদ হচ্ছে-

فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم . ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.

'আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১. পরিপূর্ণ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্নাশ ।

২. শত্রুপক্ষের অন্তরে আতংক।

৩. আমার জন্য গণীমতের সম্পদ বৈধ।

৪. সকল যমিন আমার জন্য মসজিদ ও পত্রিতা অর্জন করার মাধ্যম।

৫. আমাকে সকল মানষের নিকট প্রেরণকরা হয়েছে।

৬. এবং আমার দ্বারা নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

উম্মতের উপর রসূল সা. এর কতিপয় অধিকার :

১. রসূল সা. এর মহব্বত অবশ্য কর্তব্য, অতীব আবশ্যক। ধন-সম্পদ, নিজের জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান, পরিবার-পরিজন ও সমস্ত মানুষের মহব্বতের উপর তার মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়া। রসূল সা. বলেছেন:

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين.

'ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও সমস্ত মানুষ হতে অধিক প্রিয় না হবো।'

২. তার উপর দরদ ও সালাম পাঠ করা। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾.

(الأحزاب:٥٦)

'আল্লাহ তাআলা ও তার ফেরেস্তাগণ নবীর উপর রহমত প্রেরণ করে। হে মুমিন গণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।'[১]

৩. তার কল্যাণ কামনা করা। অর্থাৎ তার সুন্নত ও শরীয়তের হেফাজত ও রক্ষণা বেক্ষণ করা যাতে এর ভিতর কোন ধরনের সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না হতে পারে। রসুল সা. বলেছেন,

الدين النصيحة ثلاثا قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: لله عزوجل، ولكتابه، و لرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.

'দ্বীন কল্যাণ কামনার নাম: তিন বার বলেছেন, আমরা পশ্ন করলাম: কার জন্য কল্যাণ কামনা হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলমানদের প্রতিনিধিদের জন্য এবং সমস্ত মানুষের জন্য।'

৪. রসূল সা. এর আহলে বায়তের ব্যাপারে তার উপদেশ যথাযথ পালন করা। আহলে বায়ত অর্থাৎ হাশেম ও আব্দুল মুত্তালিব এর বংশধর ও রসূল সা.এর স্ত্রীগণ।

মুসলমান মাত্রই তার বংশধর এর পবিত্রতা এবং রসূল এর সাথে নৈকট্যতার প্রতি বিষেশ দৃষ্টি দিবে। অর্থাৎ তাদের অভাব মোচন করবে, মহব্বত করবে, তাদের সম্মান রক্ষা করবে। যেহেতু গাদিরে খুম এর দিন রসূল সা. স্বীয় পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে বলেছেন-

أذكركم الله في أهل بيتي.

'আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'

৫. তার সাহাবাদের মহব্বত করা এবং তাদের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখা:

প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব রসূল সা. এর সাহাবাদের মহব্বত করা। তাদের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখা। তাদের সকলের শ্রেষ্টত্বের ঘোষণা দেয়া। তাদের মাঝে সংঘটিত হয়ে যাওয়া বিরোধ নিয়ে সামালোচনা হতে বিরত থাকা।

---

১ সূরা : আল আহযাব- ৫৬

তাদের নামের সাথে رضي الله عنهم বলা। তাদের ব্যাপারে অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখা। তাদের কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। তাদের অপবাদ, গালি, কুৎসা রটনা ইত্যাদি হতে নিজের মুখ নিরাপদ রাখা।

রসূল সা. বলেছেন-

لاتسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

‘তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিও না। যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি: তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমান দান করলেও তাদের এক অঞ্জলী বা তার অর্ধেকের সমানও হবে না।’

যে সব কারণে কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে আনীত ঈমান নষ্ট হয়ে যায় :

পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে لاإله إلا الله و أن محمد رسول الله এর সাক্ষ্য প্রদান ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব শর্ত। যে ব্যক্তি এই কালেমাকে মৌখিকভাবে উচ্চারণ করবে, অর্থ ও তাৎপর্যের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এর আবেদনের উপর আমল করবে, সে এ দুনিয়াতে সৌভাগ্যবান হবে, পরম আত্মপ্রাশান্তি লাভ করবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে ইসলামের উপর বিদ্যমান আছে বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি তার অর্জিত হবে, ফলে সে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি পাবে।

এতদা সত্বেও কখনো-কখনো বান্দার উপর এমন সব অবস্থার আবর্তন ঘটে, যা তার সাক্ষ্য ভঙ্গ ও বাতিল করে দেয়। ফলে এর সূত্র ধরে সৌভাগ্য রূপ নেয় দূর্ভাগ্যের, প্রশান্তি রূপ নেয় অশান্তি ও ভয়ের, স্থীতিশীলতা রূপ নেয় পদস্খলন ও পথভ্রষ্টতার। আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত লাভ, জাহান্নাম হতে মুক্তির পরিবর্তে আল্লাহর ক্রোধ, চিরস্থায়ী জাহান্নাম ও ঘৃণিত বাসস্থানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

সাক্ষ্য ভঙ্গ ও ধর্মচ্যুত হয়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমান যুগে যাতে মানুষ সচারাচর লিপ্ত হয়, তার মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. আল্লাহ তাআলার এবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা : অর্থাৎ শিরকে আকবরের কোনো প্রকারে লিপ্ত হওয়া। যে কারণে সে দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে। জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। যেমন- আল্লাহর জন্য এবং মূর্তির জন্য সেজদাহ করা। আল্লাহ এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে কুরবানী করা। মান্নত করা। খানায়ে কা'বা, কবর এবং মূর্তির চার পাশে তওয়াফ করা। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿المائدة:٧٢﴾

'নিশ্চয় যে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশিদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[১]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. ﴿النساء:٤٨﴾

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে কাউকে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশিদার সাব্যস্ত করল, সে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করল।'[২]

২. শিরকে আকবার বা বড় ধরনের শিরক করা : যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, অথবা তার কোন কাজ অস্বীকার করা। যেমন- সৃষ্টি করণ, মালিকানা, পরিকল্পনা করা, অথবা আল্লাহ তাআলার গুণাগুণের কোন একটিকে তার মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত করা। কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। শরীয়ত ও রেসালতকে মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ ও তার রসূল এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করা ও অহমিকা প্রদর্শন করা। দ্বীনের জরুরী প্রমাণ্য বিষয়গুলো অস্বীকার করা। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : আল মায়েদা-৭২

২ সূরা : নিসা-৪৮

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة:٣٤﴾

'এবং যখন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল।'[১]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة:٩١﴾

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলে- যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাই বিশ্বাস করি, এবং তাছাড়া যা রয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে, অথচ তাদের কাছে যা আছে এ গ্রন্থ তার সত্যতা প্রমাণ করে। তুমি বল যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে, তবে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগনকে হত্যা করেছিলে?'[২]

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢١٧﴾

'তোমাদের মধ্যে যে স্বধর্ম হতে ফিরে যায়, এবং কাফের অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই তাদের কর্ম ব্যর্থ। তারা জাহান্নামের অধিবাসি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৩]

৩. বড় ধরনের নেফাক্ব : যেমন বাহ্যিক ভাবে ইসলাম প্রকাশ করা, অন্তরে অস্বীকৃতি ও কুফরী গোপন করা। অথবা বাহ্যিক ভাবে ইসলামের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করা, অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করা, অপছন্দ করা, এর বিলুপ্তি কামনা করা। অথবা বাহ্যিক ভাবে মুসলিম মুজাহিদদের পরাজয় এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কারণে চিন্তিত হওয়া, আন্তরিক ভাবে এ জন্য খুশি হওয়া। অথবা বাহ্যিক ভাবে দ্বীনের কাজ করা। এর প্রতি আহবান জানানো, এ জন্য জেহাদ করা, ভিতরে ভিতরে এর

১ সূরা : বাক্বারা- ৩৪

২ সূরা : আল বাক্বারা-৯১

৩ সূরা বাকারা : ২১৭।

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। মুসলমানদের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরী করা। মুসলমানদের সমূলে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করা। এরশাদ হচ্ছে-

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾. (الأحزاب:١٢)

'এবং মুনাফিরা ও যাদের অন্তরে ব্যধি ছিল তারা বলছিলঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।'[১]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ . (النساء:١٤٢)

'অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করেছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে।'[২]অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. ﴿النساء : ١٤٥﴾

'নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা থাকবে দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরে। আর তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।'[৩]

৪. আল্লাহ তাআলা এবং তার বান্দার মাঝখানে মাধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করা : আল্লাহ ব্যতিত যাদেরকে তারা ডাকে তাদের কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ প্রার্থনা করা। অথবা তাদের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। অথবা এমন সব জিনিসের ব্যাপারে তাদের কল্যাণের আশা রাখা, তাদের অনিষ্টকে ভয় পাওয়া- যার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা রাখেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهَّ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَّ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾. (يونس:١٨)

'আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না লাভ, এবং বলে এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ

১ সূরা : আহযাব : ১২।

২ সূরা : নিসা : ১৪২।

৩ সূরা : নিসা : ১৪৫।

যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে আর না যমীনে? তিনি পবিত্র ও তারা যা শিরক করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।'[১] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾. (الأحقاف:٥-٦)

'সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাড়াবে এবং তাদের এবাদত করা অস্বীকার করবে।'[২]

৫. মুশরিকদের কাফের না বলা : অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। অথবা তাদের ধর্মকে বৈধ স্বীকৃতি প্রদান করা বা তাদের ধর্মকে সম্মান করা :

কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের কুফরীর চুরান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন- যেহেতু তাদের ভিতর শিরক, কুফর ও স্পষ্ট গোমরাহী বিদ্যমান। এরশাদ হচ্ছে-

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهَّ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴿أل عمران:٢٨﴾

'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।'[৩] অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهَّ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهَّ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿النساء:١٥٠-١٥١﴾

১ সূরা : ইউনুস-১৮

২ সূরা : আল আহক্বাফ- ৫-৬

৩ সূরা : ইমরান-২৮

'যারা আল্লাহ ও তার রসূল এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায়, আর বলে যে, আমরা কতেককে বিশ্বাস করি, কিন্তু কতেককে বিশ্বাস করি না এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।'[১]

সুতরাং যে তাদের কুফরীর স্বীকৃতি দিবে না। অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে। অথবা তাদের ধর্মের বৈধতার স্বীকৃতি দিবে, সে বাস্তবে আল্লাহর মীমাংসিত বিষয়কে আল্লাহর উপর নিক্ষেপ করল এবং রসূল ও কুরআনকে মিথ্যারোপ করল। আর এটাই মুসলমানদের সর্ব সম্মত মতে কুফরী।

৬. নিম্নোক্ত বিশ্বাস পোষণ করা : আল্লাহ তাআলার ধর্ম ও তার রসূল সা. এর শিক্ষার তুলানায় অন্যদের ধর্ম ও শিক্ষা সয়ংসম্পূর্ণ অথবা রসূল সা. এর বিচারের তুলনায় অন্যদের বিচার ইনসাফপূর্ণ। অথবা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বর্তমানে যুগোপযোগী নয়। অথবা ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট এবাদত উৎযাপনের ভিতর সীমাবদ্ধ, মানুষের পার্থিব জীবনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা যে কোন ব্যক্তির আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার রয়েছে মনে করা। অথবা কুফরী ও মানব রচিত আইন-কানুনের মাধ্যমে বিচার করা। যদিও এ কাজগুলো সম্পাদনকারী ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি, শরীয়তে মুহাম্মদীর উপর আমল করে, এ দ্বীন সয়ংসম্পূর্ণ এবং বাকীসব ধর্ম ও শিক্ষার উপর এর প্রাধান্য রয়েছে বলে স্বীকার করে। এরশাদ হচ্ছে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿النساء:٦٠﴾.

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতিও। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে,যেন তারা তাকে অমান্য করে। আর শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।'[২]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : নিসা-১৫০-১৫১

২ সূরা : নিসা-৬০

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ . (سورة النساء:٦٥)

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না নেয়। তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে।'[১]

৭. রসূল সা. বা তার আনীত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা : বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি উক্ত বিধান পালন করুক বা না করুক উভয় সমান অপরাধ। এরশাদ হচ্ছে:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ سورة محمد : ٩﴾

'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, অতএব আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।'[২]

ঈমানের বিপরীত কুফরীই একমাত্র আমল নস্যাৎ করে। এখানে তারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে অপছন্দ করে কুফরি করেছে, তাই তাদের আমল আল্লাহ তাআলা বাতিল করে দিয়েছেন।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ سورة الأنعام:٨٨﴾

'যদি তারা শিরক করতো, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত।'[৩]

৮. উপহাস করা : আল্লাহ, রসূল, কুরআন, শরীয়ত, শরীয়তের কোনো নিদর্শন, সওয়াব, শাস্তি অথবা দ্বীনের উপর অবিচল ও দ্বীনের প্রতি আহবান কারীদের সাথে- দ্বীনের উপর অবিচল থাকার কারণে, দ্বীনের প্রতি আহবান জানানোর কারণে- উপহাস করা। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : আন নিসা-৬৫

২ সূরা : মুহাম্মদ-৮

৩ সূরা : আনআম-৮৮

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .
(سورة التوبة:٦٥-٦٦)

'আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম-আহকামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্রা করছিলে? ছলনা করো না, ঈমান গ্রহণের পরও তোমরা কাফের হয়ে গেছ।'[১]

৯. বন্ধুত্ব স্থাপন করা : মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের মহব্বত করা এবং মুসলমানদের বিপরীত তাদের সাহায্য করা। এরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾. (سورة المائدة:٥١)

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।'[২]

১০. যাদু : যার একটি শাখা কাল চক্র : অর্থাৎ যাদুর একটি আমল যার মাধ্যমে মানুষকে তার মানবপ্রকৃতি হতে ফেরানো হয়, যেমন- স্বামীকে স্ত্রীর বিপরীত অথবা স্ত্রীকে স্বামীর বিপরীত মহব্বতের পরিবর্তে শত্রুতা করা।

আরেকটি শাখা সহানুভুতি: যাদুর এমন একটি দিক আছে যার মাধ্যমে মানুষকে তার অভিষ্ট জিনিসের প্রতি শিরকের পদ্ধতিতে আকষর্ণীয় করে তোলা হয়। যে এ কাজ করল বা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল সে মূলত কুফরী করল। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. (سورة البقرة:١٠٢)

'তারা উভয়ে একথা না বলে কাউকে বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরিক্ষার জন্য, কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।'[৩]

১১.আল্লাহর শরীয়ত এবং তার দিক নির্দেশনা হতে অন্তর-কর্ণ সহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা : যদিও সে শরীয়তকে সত্যারোপ কিংবা মিথ্যারোপ কোনটাই করে না। এর সাথে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতাও পোষণ করে না। এবং কোনো ভাবে এর প্রতি কর্ণপাতও করে না। এরশাদ হচ্ছে-

---

১ সূরা : তওবাহ-৬৫-৬৬

২ সূরা : মায়েদা-৫১

৩ সূরা : বাক্বারা-১০২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾. (سورة السجدة:٢٢)

'যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়। অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব[১]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾. (سورة الأحقاف:٣)

'আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' [২]

উল্লেখিত সমস্ত বিষয় ঈমান বিনষ্টকারী। উপহাস, ঠাট্রা, ইচ্ছা কিংবা ভয় যেভাবেই করুক সর্বাবস্থায় তা কুফরী। তবে জবরদস্তিমুলক কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলে তার বিষয়টি আলাদা। এরশাদ হচ্ছে-

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴿١٠٦﴾. (سورة النحل:١٠٦)

'যার উপর জবর দস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে ব্যতীত।'[৩]

চাপ প্রয়োগকৃত ব্যক্তির কুফরীকথা বা কাজের সাথে শর্ত হলো তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকতে হবে।

ঈমান : বুনিয়াদ ও পরিণতি

১ সূরা : সাজদাহ- ২২

২ সূরা : আল আহক্বাফ-৩

৩ সূরা : নাহল-১০৬

ইসলামের পরিভাষায় ঈমান : আত্মার স্বীকৃতি বা সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। ভালো কাজে ঈমান বৃদ্ধি পায়, মন্দ কাজে ঈমানহ্রাস পায়।

ঈমানের রুকনসমূহ

যে সকল ভিত্তির উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত তার সংখ্যা মোট ছয়টি বলে নবী আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন—

الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

অর্থ–

১. আল্লাহর উপর বিশ্বাস।
২. তার ফেরেস্তাদের উপর বিশ্বাস।
৩. তার কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস।
৪. তার প্রেরিত নবী রাসুলদের উপর বিশ্বাস।
৫. পরকালের উপর বিশ্বাস।
৬. 'নিয়তির ভাল-মন্দ আল্লাহর হাতে' এ কথায় বিশ্বাস।[১]

ঈমানের শাখাসমূহ

ঈমানের ৭৭ টির বেশি শাখা রয়েছে।

أعلاها قول: لا إله إلاالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

ঈমানের সর্বোত্তম শাখা এ স্বীকৃতি প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আর ঈমানের নিম্নতম শাখা হলো কষ্টদায়ক বস্তু পথ হতে অপসারণ করা এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[২]

সালাফে সালেহীনের নিকট ঈমানের মৌলিকত্ব

প্রথমত: আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন চারটি বিষয় দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয় বলে সালাফে সালেহীন মনে করেন।

---

১ মুসলিম : ৯
২ মুসলিম :৫১

১. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

২. আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সব কিছুর প্রকৃত মালিক, সব কিছুর প্রতিপালন তিনিই করেন।

৩. আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য। এ ক্ষেত্রে কোন মর্যাদাবান ফেরেস্তা বা আল্লাহ প্রেরিত কোন নবী রাসূলের অংশিদারিত্ব নেই।

৪. আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন। এর ধরণ হলো, কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী বান্দা শুধু মাত্র তার জন্যই প্রয়োগ করবে। সেগুলোর প্রতি অবিকল বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঐ ভাবেই তাকে ডাকবে। এসকল নাম ও গুনাবলীতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের আশ্রয় নিবে না। রূপক অর্থ গ্রহণ করবে না এবং এর কোন সদৃশ স্থির করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى:١١)

তার মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলাফলঃ

চারটি নীতিমালার আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের মূল। এবং ঈমানের অবশিষ্ট রুকুনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি পূর্ণতা পায়। উপরোল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসারে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা কর্তব্য। যখনই কোন জাতি বা গোষ্ঠি আল্লাহর উপর ঈমানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ চারটি মৌলিক নীতিমালার প্রতি দিকপাতে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, তখনই তাদের অন্তর নিমজ্জিত হয়েছে গহীন অন্ধকারে। তারা পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। এবং ঈমানের অপরাপর ভিত্তির ক্ষেত্রেও সত্যের অনুসরণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেস্তাগণ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। আল্লাহ তাদেরকে নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তার আদেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের যোগ্যতা এবং তার আদেশ বাস্তবায়নের শক্তি-সামর্থ দান করেছেন। প্রভু অথবা উপাস্য হওয়ার নূন্যতম কোন বৈশিষ্ট্য তাদের নেই। তারা হলেন সৃষ্ট। আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন

১ সুরা : শুরা আয়াত- ১১

এবং মর্যাদা দিয়েছেন তার সম্মানিত বান্দা হিসেবে। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষের সাথে তাদের কোন মিল নেই। তারা পানাহার করেন না, ঘুমান না, বিবাহের প্রয়োজন নেই তাদের। যৌন চাহিদা হতে তারা মুক্ত, এমনকি যাবতীয় পাপাচার হতেও। মানুষের নানান আকৃতিতে আত্মপ্রকাশে তারা সক্ষম।

চারটি বিষয়ের মাধ্যমে ফেরেস্তার উপর ঈমান পূর্ণ হয়

১. আল্লাহ তাদের যে সকল গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুসারে তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

২. কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাদের যে সকল নাম আমরা জেনেছি, সে গুলো বিশ্বাস করা, যেমন জিব্রাইল, ইস্রাফিল, মিকায়ীল, মালিক, মুনকার, নাকীর এবং মালাকুল মাউত ফেরেস্তাবৃন্দ এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম আমাদের জানা নেই, তাদেরকেও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা।

৩. তাদের মধ্য হতে যার বৈশিষ্ট্যের কথা কোরআনে এবং বিশুদ্ধ হাদীসে আমরা জেনেছি, তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন, জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন যে আকৃতিতে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন অবিকল সে আকৃতিতে। যিনি তার ছয়শত ডানায় আচ্ছাদিত করেছিলেন আদিগন্ত। এমনিভাবে আরশ বহনকারী ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তার এক কান হতে অপর কানের দূরত্ব হলো সাতশত বছরের পথ।

৪. তাদের মধ্য হতে যাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অবগতি লাভ করেছি, তা বিশ্বাস করা। যেমন, ক্লান্তিহীনভাবে দিনরাত তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকেন। কোন প্রকার অবসাদ তাদের স্পর্শ করে না। তাদের মধ্য রয়েছেন, আরশবহনকারী, জান্নাতের প্রহরী এবং জাহান্নামের রক্ষী। আরো আছেন এক ঝাক ভ্রাম্যমান পবিত্র ফেরেস্তা, যারা আল্লাহর আলোচনা হয় এমন স্থানসমূহকে অনুসরণ করেন।

কতিপয় ফেরেস্তার বিশেষ কাজ

- জিব্রাইল : অহী আদান প্রদানের দায়িত্বশীল, এবং নবী রাসূলের নিকট অহী নিয়ে অবতরণের দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে।
- ইস্রাফিল : পুনরুত্থান দিবসে সিংগায় ফূৎকারের দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত হয়েছে।

- মিকায়ীল : বৃষ্টি ও উদ্ভিদ উৎপন্নের দায়িত্বশীল।
- মালিক : জাহান্নামের দায়িত্বশীল।
- মুনকার এবং নাকীর : তাদের উভয়ের প্রতি কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।
- মালাকুল মাউত : রূহ কবজের দায়িত্ব তার।
- আল মুয়াক্কিবাত : বান্দাদের সর্বাবস্থায় রক্ষার দায়িত্ব তাদের।
- আল কিরামুল কাতিবুন : আদম সন্তানদের দৈনন্দিন আমল লেখার কাজে তারা নিয়জিত।

এছাড়া আরো অনেক ফেরেস্তা আছেন, যাদের আমল সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ (المدثر: ٣١)

আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এ তো মানুষের জন্য উপদেশ মাত্র।[১]

ফেরেস্তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ব্যক্তি জীবনের নানান উপকারিতার কারণ। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:—

১. আল্লাহর বড়ত্ব এবং শক্তি সম্পর্কে জানা। কারণ সৃষ্টির বড়ত্ব স্রষ্টার বড়ত্বের প্রমাণ বহন করে।

২. আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের জন্য কায়মনোবাক্যে এ শুকরিয়া জ্ঞাপন করা যে, তিনি ফেরেস্তা নিয়োজিত করে মানুষকে রক্ষা করেছেন বিভিন্ন আপদ-বিপদ হতে ; তাদের আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা, আরশে তাদের দোয়া পৌঁছে দেয়া, তাদের জন্য ইস্তেগফার, পুরস্কারের সংবাদ দান—ইত্যাদি দায়িত্বগুলো তাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন।

৩. তারা আল্লাহর একান্ত অনুগত ও ইবাদতগুজার—এ জন্য তাদের মোহাব্বাত করা।

৪. ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া। কারণ, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের দৃঢ় মনোবল দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

১ সুরা : আল মুদ্দাসসির: আয়াত: ৩১

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٢﴾ (الأنفال: ١٢)

ঐ মুহূর্তকে স্মরন করুন যখন আপনার প্রভু ফেরেস্তাদের নির্দেশ করলেন আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। সুতরাং, ঈমানদারদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির রাখ।[১]

৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহর পর্যবেক্ষণের আওতায় এবং পরিপূর্ণ সজাগ থাকা ; যেন মানুষের কাছ থেকে বৈধ এবং নেক আমল ব্যতীত কোন গুনাহ প্রকাশ না পায়। কারণ মানুষের আমলসমূহ লেখার জন্য আল্লাহ তাআলা সম্মানিত ফেরেস্তা নিয়োজিত করেছেন। তারা মানুষের সকল কর্মকান্ড বিষয়ে অবগত হয়ে থাকেন। তারা সর্বাবস্থায় তাদের রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম।

৬. ফেরেস্তাদের কষ্ট হয় এই ধরণের কাজ হতে বিরত থাকা। গুনাহের কাজ হলে তারা কষ্ট পায়। এজন্য তারা কুকুর এবং প্রাণীর ছবি আছে এমন ঘরে প্রবেশ করে না। দুর্গন্ধ বস্তু তাদের কষ্টের উদ্রেক করে। যেমন- মসজিদে পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া অথবা খেয়ে মসজিদে যাওয়া।

তৃতীয়ত: কিতাব সমূহের উপর ঈমান

কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব কিতাব, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য, এবং যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূলের প্রতি রহমত ও পরকালে তাদের জন্য নাজাত ও কল্যাণ স্বরূপ জিব্রাইলের মাধ্যমে রাসূলদের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ

১. এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে আলোকবর্তিকা, হেদায়েতের আকর হিসেবে, সত্য ধর্ম নিয়ে।

২. বিশ্বাস করা যে এ হলো আল্লাহর কালাম বা কথা। কোন সৃষ্টির কালাম নয়। জিব্রায়ীল আল্লাহর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। আর রাসূল শ্রবণ করেছেন জিব্রায়ীল থেকে।

৩. বিশ্বাস করা সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিধি-বিধান ঐ জাতির জন্য অবশ্যই পালনীয় ছিল, যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. বিশ্বাস করা আল্লাহর সকল কিতাব একটি অপরটিকে সত্যায়ন করে। পরস্পর কোন বিরোধ নেই। তবে বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ কোন কারণে হয়ে থাকে, যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

---

১ সুরা : আল–আনফাল: আয়াত:১২

৫. কিতাবসমূহ হতে যেগুলোর নাম আমারা জানি সেগুলো বিশ্বাস করা। যেমন—

- আল কুরআনুল কারীম : যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- তাওরাত: যা মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- ইঞ্জিল: যা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- যাবূর: যা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- ইব্রাহিম এবং মূসা আলাইহিস সালামের উপর সহীফাহ সমূহ।

এছাড়া সাধারণভাবে ঐ সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করা যার নাম আমাদের জানা নেই।

৬. বিশ্বাস করা আসমানী সকল কিতাব এবং তার বিধান রহিত হয়েছে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণের মাধ্যমে। রহিত সে কিতাবগুলোর বিধান অনুসারে আমল কারো জন্য বৈধ নয়। বরং সকলের প্রতি কুরআনের অনুকরণ, অনুসরণ ফরজ। এ একমাত্র কিতাব, যার কার্যকারিতা কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। অন্য কোন কিতাব কুরআনুল কারীমের বিধানকে রহিত করতে পারবে না।

৭. নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য ঐশী গ্রন্থগুলো বাণী-বক্তব্যের সত্যতার প্রতি কোরআনের মতই বিশ্বাস স্থাপন করা।

৮. এ মত পোষণ করা যে পূর্বের সকল কিতাবে পরিবর্তন-বিকৃতি ঘটেছে। কেননা, যে জাতির নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, রক্ষার দায়িত্বও তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনুল কারীম যাবতীয় বিকৃতি হতে সুরক্ষিত। কেননা, এর রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ (الحجر: ٩)

‘নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।’[১]

মুসলিম জীবনে আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমানের উপকারিতা

আল্লাহ তাআলা তার একান্ত অনুগ্রহে পৃথিবীর তাবৎ জাতির কাছে তাদের জন্য অশেষ মঙ্গলজনক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এ ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি ও জ্ঞান লাভ করা জরুরী।

---

১ সুরা : হিজর: আয়াত: ৯

১. আমাদের এ ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি লাভ করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আপন প্রজ্ঞায় প্রতিটি জাতির জন্য উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন, এ তার পূর্ণ প্রজ্ঞারই পরিচায়ক।

২. আল্লাহ যে যাবতীয় সংশয় হতে মুক্ত বিধান সম্বলিত কুরআন আমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন, সে জন্য তার শোকর আদায় করা। এই কুরআন হলো কিতাব সমূহের মধ্যে অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং এই কুরআন অন্য সকল কিতাবসমূহের প্রকৃত বিধানাবলীর রক্ষক।

৩. কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া, এবং তার তিলাওয়াত করা, অর্থ বোঝা, মুখস্ত করা, গবেষণা, বিশ্বাস, আমল এবং এ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করা।

চতুর্থতঃ নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন

প্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালাম, প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿١٦٣﴾ (النساء: ١٦٣)

অর্থ : আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং পরবর্তী সমস্ত নবীদের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন।[১]

এবং শেষ নবী ও রাসূল হলেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দলীলঃ আল্লাহর বাণী—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿٤٠﴾ (الاحزاب: ٤٠)

অর্থঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।[২]

আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান এবং তার সাথে শিরক করা থেকে মুক্ত থাকার আহবানের ক্ষেত্রে সকল নবী-রাসূলের আহবান ছিল অভিন্ন। প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্রষ্টব্য

---

১ সূরা : আন–নিসা, আয়াত:১৬৩

২ সূরা : আল আহযাব আয়াত-৪০

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾ . (النحل: ٣٦)

'নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাগুতকে প্রত্যাখান করবে।'[১]

তবে বিধি–বিধান এবং অবশ্যই করণীয় ফরজকাজ সমূহের আহবানের ক্ষেত্রে সকলই একই বক্তব্যের অধিকারী ছিলেন না। বরং প্রেক্ষাপট অনুসারে তাদের বক্তব্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন, অবস্থা ভেদে বিবিধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدة: ٤٨)

অর্থ: 'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।'[২]

নবী রাসূলদের প্রতি ঈমানের প্রকৃতি

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কতিপয় বিশ্বাসকে বোঝায়।

১. বিশ্বাস করা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ (الفاطر: ٢٤)

অর্থ: 'কোন জাতি নেই, যে তার কাছে সর্তককারী প্রেরণ করা হয়নি।'[৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا (النحل: ٣٦)

'আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি।'[৪]

২. নবীগণ আল্লাহর কাছ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তার ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সত্যবাদী- এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম। তাদের আহবান ছিল একত্ববাদ। তাদের যে কোন একজনের রিসালাতকে অস্বীকার এবং মিথ্যা মনে করার অর্থ হচ্ছে সকলের রিসালাত অস্বীকার এবং সকলের প্রতি মিথ্যারোপ করা।

৩. এই অভিমত পোষণ করা যে তারা হলেন নেককার, পরহেজগার রাসূল। আল্লাহ তাদের উত্তম চরিত্র এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা শোভিত করেছেন।

---

১ সূরা : আল নাহল: আয়াত-৩৬

২ সূরা : আল মায়েদা: আয়াত- ৪৮

৩ সূরা আল-ফাতির-২৪

৪ সূরা : নাহল আয়াত-৩৬

তাদের কাছে প্রেরিত অহীর সবটুকুই তারা মানুষকে অবগত করিয়েছেন, সামান্যতম গোপনতা, বৃদ্ধি ও কিংবা বিকৃতির আশ্রয় তারা নেননি।

৪. কুরআনুল কারীমে এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত তাদের যে সকল নাম আমরা জানি যেমন: নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিশ্বাস করা। এবং যে সকল নাম আমরা অবগত নই, তাও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা।

৫. কুরআনুল কারীম এবং বিশুদ্ধ হাদীসে তাদের সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে তা গ্রহণ করা।

৬. তাদের মধ্য হতে যাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তার শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপন করা। তিনি হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৭. বিশ্বাস করা যে, তাদের একে অপরের মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উলুল আযমবৃন্দ (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগন) : নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার কতিপয়কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ কর্তৃক তার বন্ধু বলে সম্বোধন করা; মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা। ইব্রাহীমের মত তাকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, এবং মেরাজের রজনীতে তার সাথে কথোপকথন—ইত্যাদি।

৮. বিশ্বাস করা যে, কেউ নবী হওয়া তার আপন ইচ্ছাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কেউ নিজের চেষ্টায় নবী হতে পারবে না। নবুয়্যতপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতা আমাদের নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের মধ্য দিয়ে শেষ এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নবীদের উপর ঈমানের উপকারিতা

নবীদের উপর ঈমান আনয়নের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে—

১. বান্দার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ এবং দয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন।

২. এ মহা মূল্যবান নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. প্রত্যেক নবী রাসূলের যোগ্যতানুযায়ী তাদের প্রশংসা, সম্মান এবং মুহাব্বত করা।

৪. আল্লাহ তাআলার যে কোন আদেশ বাস্তবায়নে তাদের কায়মনোবৃত্তিতে আমাদের জন্য মহৎ শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহর আদেশে ইব্রাহিম আ. কর্তৃক তার সন্তানকে কোরবানী করা। আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবানে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া এবং একাজে যে কোন ধরনের কষ্ট হাসি মুখে সহ্যকরা, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষনীয়।

৫. আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে রাসূলের মুহাব্বতের প্রকৃত বাস্তবায়নে আগ্রহী হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾. (الأحزاب: ٢١)

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'[১]

পঞ্চমত: পরকালে বিশ্বাস করা

পরকালে বিশ্বাসে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

১. পুনরুত্থানে বিশ্বাস: অর্থাৎ একদিন তাবৎ মৃতদের জীবিত করা হবে এবং তারা পুনরুত্থিত হবে বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾. (المؤمنون: ١٦-١٥)

অর্থ: 'এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কেয়ামতের দিন তোমারা পুনরুত্থিত হবে।'[২]

২. হিসাব এবং প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তাআলা বান্দার ভালো এবং মন্দ সকল কাজের হিসাব নিবেন এবং এর জন্য বান্দা শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

১ সূরা : আল আহযাব: আয়াত-২১

২ সূরা : আল মুমিনুন, আয়াত- ১৫-১৬

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ (زلزال: ٨)

'যে সামান্য পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে সামান্য পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।'[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾. (ألغاشيه: ٢٦-٢٥)

'নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, অত:পর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।'[২]

৩. জান্নাত এবং জাহান্নামকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করা এবং সৃষ্টির জন্য সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলে মনে করা। জান্নাত হলো সুখ, শান্তি আরামের স্থান, যা সৃষ্টি করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্য। আর জাহান্নাম হলো দু:খ,কষ্ট ও অশান্তির স্থান, যা কাফেরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. যে সকল বিষয় মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন সে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা। যেমন কবরে শাস্তি অথবা শান্তি, মুনকার এবং নাকীর ফেরেস্তার প্রশ্ন করা, হাশরের ময়দানে সূর্য একেবারে মাথার নিকটবর্তী হওয়া, পুলসিরাত, মিজান বা পাল্লা, আমলনামা, হাউজে কাউসার, আল্লাহর নবীর সুপারিশ সবই আছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পরকালে বিশ্বাস দ্বারা লাভ

পরকালে বিশ্বাস দ্বারা অনেক লাভ রয়েছে। তন্মধ্যে—

১. পরকালে আল্লাহর পুরস্কার লাভের আশায় বান্দার নেক আমলে আগ্রহী হওয়া।

২. পরকালে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে বান্দার পাপাচার থেকে দূরে থাকা।

৩. পরকালে আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত সুখ, শান্তি অর্জনের আশায় ইহকালের যে আরাম-আয়েশ তার হাতছাড়া হচ্ছে তাতে মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা।

ষষ্ঠ: তাক্বদীর বা নিয়তির উপর বিশ্বাস করা:

---

১ সূরা : সুরা যিলযাল, আয়াত-৮

২ সূরা : আল-গাশিয়াহ, আয়াত:২৫-২৬

তাক্বদীরে বিশ্বাসের অর্থ : আল্লাহর রহস্যগুলোর মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে তাক্বদীর বা নিয়তি। কোন নিকটতম ফেরেস্তা অথবা প্রেরিত রাসূল এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাক্বদীরের উপর ঈমানের অর্থ বান্দা এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা তার ইলম এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে কি হয়েছে, কি হবে, কি হচ্ছে সব কিছু পূর্বেই তিনি নির্ধারণ করেন।

তাক্বদীরের উপর বিশ্বাসের স্তরসমূহ

তাক্বদীরে বিশ্বাসের চারটি স্তর রয়েছে :

১. আল-ইলম বা জানা : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সৃষ্টির জন্য কোন বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত সবকিছুর সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলার অবগত হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ (الأحزاب: ٤٠)

'আল্লাহ সর্ব বিষয় জ্ঞাত'।[১]

২. আল-কিতাবাহ বা লিখন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশ এবং পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার সব কিছু লাউহে মাহফুজে লেখে রেখেছেন। দলীল, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾. (الحديد: ٢٢)

অর্থ: পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না, যা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নিশ্চয় এ আল্লাহর পক্ষে সহজ।[২]

৩. আল–মাশিয়্যাত বা ইচ্ছা : এর উদ্দেশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়, আর তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা কখনোই হয় না। দলীল, আল্লাহর বাণী

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿٦٨﴾. (القصص: ٦٨)

অর্থ: 'আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।'[৩]

---

১ সূরা : আল-আহজাব, আয়াত-৪০

২ সূরা : আল হাদীদ, আয়াত- ২২

৩ সূরা আল–কাসাস, আয়াত-৬৮

৪. আল–খালকু বা সৃষ্টি: এর উদ্দেশ্য সারা জগত তার সকল অস্তিত্ব, রূপ এবং কর্মসহ একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি বা মাখলুক। দলীল, আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ . (الفرقان: ٢)

অর্থ: 'তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অত:পর শোধিত করেছে পরিমিতভাবে।'[১]

তাক্বদীরে বিশ্বাস দ্বারা লাভ

তাক্বদীরে বিশ্বাস দ্বারা অনেক লাভ রয়েছে। তন্মধ্যে–

১. বান্দা আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে, এবং তার জ্ঞানের প্রশস্ততা, ব্যাপকতা এবং জগতে ছোট-বড় সব কিছু তার আয়ত্বে তা সম্পর্কে জানে। আরো জানে তার রাজত্বের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে যে, তার অনুমতি ছাড়া সেখানে কোন কিছুই সংঘঠিত হয় না।

২. বান্দা তার সকল কাজে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে। কোন বস্তুর উপর নয়। কারণ সব কিছুই আল্লাহরই কুদরতে চলে।

৩. মানুষ কোন কাজে সফলতা পেলে অহংকার করবে না। কারণ এ সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অনুগ্রহ মাত্র। আল্লাহই তাকে এই কাজ করার যোগ্যতা ও তাওফীক দান করেছেন।

৪. কোন প্রিয় বস্তুর বিরহ অথবা কোন বিপদ দেখা দিলে আত্মার দৃঢ়তা ও প্রশান্তি লাভ হয়। কারণ সে বিশ্বাস করে সকল কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা এবং হুকুমে হচ্ছে।

তাক্বদীরে নির্ভরতার যুক্তি দেখানোর শরয়ী বিধান

তাক্বদীরে বিশ্বাসীর উপর অপরিহার্য যে, সে তাক্বদীরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে, ওয়াজিব এবং হারাম কাজে জড়িত হতে পারবে না এবং নেক কাজে অলসতা প্রদর্শন সে করবে না।

سئل النبي صلي الله عليه وسلم : أعُلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم قال: ففيم يعلم العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. (البخاري و مسلم)

---

১ সূরা : আল-ফোরকান, আয়াত- ২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কে জাহান্নামে যাবে তা কি জানানো হয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, প্রশ্নকারী বলল: তাহলে আমলের প্রয়োজন কি ? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেকের জন্য সে পথে গমন সহজ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

যে ব্যক্তি তাক্বদীরকে গুনাহের কাজের বৈধতার যুক্তি হিসাবে পেশ করে, সে বলে আল্লাহ পাপ কাজ করাকে আমার নিয়তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই আমি তা ছাড়বো কিভাবে ? এই ব্যক্তির অবস্থা হল, কেউ যদি জোরপূর্বক তার সম্পত্তি নিয়ে যায়, অথবা তার ইজ্জতহানী করে, সে বলে না এটা আমার নিয়তিতে ছিল, করার কিছুই নেই। বরং সে তার সম্পদ উদ্ধার এবং অপরাধীর বিচারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। সুতরাং, তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে গুনাহ করা কিভাবে বৈধ হবে ? আর সে যখন কোন গুনাহ করে বলবে, এটা আমার তাক্বদীরে ছিল ? অতঃপর তার গুনাহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বুঝার বিষয় হল মানুষ জানে না ভবিষ্যতে কি হবে ? তাহলে সে কিভাবে মনে করে যে, আল্লাহ তার নিয়তিতে গুনাহ করা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সে গুনাহ পরিত্যাগ করে না। আল্লাহ তাআলা রাসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সিরাতে মুস্তাকীমের বর্ণনা দিয়েছেন। আকল-বুদ্ধি, চোখ, কান দান করেছেন। ভালো-মন্দ যাচাই করে চলার যোগ্যতাও আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন। অতএব এই সব বলে কেউ তার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। আমাদের জানা দরকার বিবাহ ছাড়া যেমন সন্তান আসে না, খাবার ছাড়া যেমন পরিতৃপ্তি আসে না, তেমনি আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন এবং নিষেধগুলো বর্জন ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাই মানুষের জন্য অবশ্যই করণীয় হল আল্লাহ খুশি হন এমন কাজ করা এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ বর্জন করে জান্নাতের অনুসন্ধান করা এবং এই জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করা। দুর্বলতা এবং অলসতা পরিহার করা। বাসনা করলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কারণ এটা আল্লাহর পণ্য। আর আল্লাহর পণ্য খুবই মূল্যবান।

হ্যাঁ, দুনিয়াতে বিপদ আপদ তো আসবেই। এটা দূর করা সম্ভব নয়। মানুষের জানা উচিত বিপদ আপদ তাক্বদীরে আছে বলেই হয়। তখন বলবে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। বিপদে ধৈর্যধারণ করা, খুশি থাকা, মেনে নেওয়া পাক্কা ঈমানদারের কাজ।

---

১ বুখারী ও মুসলিম.......

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، و إن أصابك شيئ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. (رواه مسلم)

দূর্বল মুমিনের তূলনায় সবল মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর প্রিয়। প্রত্যেকের মাঝেই কল্যান রয়েছে। তুমি প্রচেষ্টা কর তোমার মঙ্গলের জন্য। এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। অক্ষমতা প্রকাশ করো না। আর যদি তোমার কোন বিপদ দেখা দেয় বলো না, “যদি আমি এভাবে করতাম তাহলে এরকম হতো। বরং বল : আল্লাহই আমার নিয়তিতে এটা রেখেছেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। কারণ ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।[১]

১ মুসলিম

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা : ইসলামী দৃষ্টিকোণে

'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'আল-ওয়ালা' শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব স্থাপন ও আল-বারা শব্দের অর্থ শত্রুতা বা সম্পর্কচ্ছেদ।

মুসলমানের বাস্তব জীবনে আল্লাহর জন্য ওয়ালা এবং বারা বা আল্লাহর জন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতার যে ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল, তা মুছে যাওয়া এবং দুর্বল হয়ে যাওয়ার বড় কারন হল আল্লাহর জন্য মুসলমানের ইবাদাত এবং মুহব্বত কমে যাওয়া। কারণ আল্লাহর ইবাদত ও তার জন্য ভালোবাসা হলো সবকিছুর মুল। এ থেকেই মুহাব্বত বা কারো সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ঘৃণা বা কারো সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করন বেরিয়ে আসে। যখনই কোন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং মুহাব্বতে পূর্ণতা আসে, তখনই সে ওয়ালা এবং বারার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ভুমিকা রাখে। যখনই মুসলমানের মধ্যে পদ, নারী এবং সম্পদের আসক্তি গভীর ভাবে প্রবেশ করল, এবং মনচাই জীবন যাপনের টোপ তারা গিলে ফেলল, তখন তারা মনের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি মতো যার তার সাথে বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুরু করে দিল। ঐ সকল জাগতিক প্রিয় বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহর জন্য উবুদিয়্যাত বা দাসত্বিতে দুর্বলতা আসল।

বন্ধ হয়ে পড়ল তাদের মধ্যে আল্লাহর এবাদত এবং মুহাব্বত। অতঃপর আল্লাহর জন্য শত্রুতার যে ঐতিহ্য তাদের মধ্যে ছিল তা মারাত্মক ভাবে কমে গেল। অতএব আমরা বলতে পারি আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্যই শত্রুতা এবং তার উপকরণ সমূহের মূলত: জন্মই হয় আল্লাহর মুহাব্বত ও ইবাদত থেকে।

জানা উচিত ওয়ালা ও বারা ঈমানের অংশ। বরং ঈমানের জন্য শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾.

"আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি তবে তারা কাফেরেদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।[১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শর্তবোধক বাক্যের দাবি হল শর্ত পাওয়া গেলে শর্তাধীন বস্তুটিও পাওয়া যাবে। অন্যথায় নয়। যা আল্লাহর বাণী

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿المائدة:٨١﴾.

মধ্যে আরবী হরফ لو (লাও) থেকে বোঝায়। যার অর্থ: যদি তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করত না। এতে বুঝা যায় অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্ক এক সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। আরো বুঝা যায়, যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ এবং নবী স. এবং নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমানের যে দাবী, তা তারা পালন করছে না।

আরো জানা উচিত যে, আল-ওয়ালা এবং আল-বারা ঈমানের অধিকতর নিরাপদ বন্ধন। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله (رواه أحمد والحاكم)

অর্থাৎ ঈমানের অধিকতর নিরাপদ বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা।[২]

---

১ সুরা আল মায়েদাহ- ৮০-৮১

২ আহমদ, হাকেম

'দ্বীনের পূর্ণতা, জিহাদি ঝান্ডার প্রতিষ্ঠা অথবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ মিশন সফল হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব, আল্লাহর জন্য শত্রুতার নীতি গ্রহণ করা হবে। শত্রু-মিত্রের বিচার না করে সব মানুষ যদি সঠিক পথের অনুসারী হতো তবে হক্ব-বাতিল, ঈমান-কুফুর, আল্লাহর বন্ধু এবং শয়তানের বন্ধুর মাঝে কোন পার্থক্য যুগ যুগ ধরে চলে আসত না'। [১]

আবু ওয়াফা বিন আক্বীল (মৃত্যু: ৫১৩ হি:) এর একটি বাক্য লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন—

"কোন জনপদের অধিবাসীদের ইসলাম সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে যদি ইচ্ছে করেন, তবে মসজিদে তাদের ভীড় দেখে এবং আরাফার মাঠে গিয়ে প্রকম্পিত আওয়াজে তাদের লাব্বাইক আওয়াজ দেখে নয়। বরং এজন্য দৃষ্টি দিবে ইসলামী শরীয়তের শত্রুদের সাথে তাদের অবস্থানের উপর।"

ইবনে আল রুয়ান্দি, আল মুয়ারী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা গদ্যে এবং পদ্যে নাস্তিকতা ছড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। মেলাতে আসা মাত্রই চড়া দামে তাদের বই বিক্রয় হয়ে যেত। ভোগ বিলাসে তাদের জীবন কেটেছে। তাদের সমাধিতে স্মৃতিসৌধও নির্মান হয়েছিল। এ সব তাদের ও ঐ জনপদের অধিবাসীদের ঈমানের প্রদিপ শীতল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[২]

'আল-ওয়ালা আল-বারা' র অর্থ :

ওয়ালা অর্থ : হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা।

বারা অর্থ: ঘৃণা, শত্রুতা, দূরত্ব। মূলত: ওয়ালা এবং বারা হচ্ছে মনের বিষয়। তবে তা মুখে এবং অঙ্গ-পত্যঙ্গে তা প্রকাশ পায়। ওয়ালা বা বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলা, তার রাসুল সা. এবং মুমিনদের জন্য হয়ে থাকে—

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴿المائدة:٥٥﴾

"নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু হল আল্লাহ, তার রাসুল এবং যারা ঈমানদার"।[৩]

মুমিনদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশের মাধ্যম হলো ঈমানের কারনে তাদেরকে ভালবাসা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের উপর অনুগ্রহ করা, তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদেরকে সালাম দেয়া, তাদের অসুস্থ

---

[১] আওসাক আল-ওরাল ঈমান : শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ

[২] মানলি আদাবিশ্শরিয়া ১ম খন্ড

৩ সূরা : আল মায়েদা - ৫৫

ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তাদের মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা, তাদের সার্বিক খোজ খবর রাখার ইত্যাদি।

কাফেরদের সাথে শত্রুতা প্রকাশের নীতির উদ্দেশ্য হল তারা কাফের এজন্য ঘৃণা প্রকাশ করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য না করা, তাদেরকে আগে সালাম না দেওয়া, তাদের অনুগত না হওয়া, অথবা তাদের কারণে গর্ববোধ প্রকাশ না করা, তাদের অনুকরন থেকে দুরে থাকা, ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হাত, মুখ এবং সম্পদের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রয়োজনে কুফুরী রাষ্ট্র বা সরকার থেকে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারে হিজরত করা। এছাড়া কাফের হওয়ার কারণে শত্রুতা প্রকাশের আরো যত মাধ্যম আছে তা ব্যবহার করে শত্রুতা প্রকাশ করা। বিস্তারিত আল্লামা কাহতানীর আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা অথবা আল্লামা জালউদ এর 'কিতাবুল মুআলাত ওয়াল মুআদাত' দেখুন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর জন্য আল-ওয়ালা

আহলেসুন্নত ওয়াল-জামাত মানুষকে দয়া করেন। এবং তারা হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। মুমিনদের প্রতি তারা যত্নবান। তারা মধ্যপন্থী, সহানুভূতিশীল, কল্যাণকামী ও সুপরামর্শদাতা। তারা সকল মুসলমানকে একটি দেহ মনে করেন। যখনই দেহের কোন অংশে ব্যথা হয় তখন সমস্ত দেহে তা অনুভব হয়। আল্লামা আইয়্যুব সাখতীয়ানী বলেন;

إنه ليبلغني عن الرجل من أهل السنة إنه مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. (الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (قوام السنة) ٢/ ٤٨٧.

যখন আমার কাছে কোন আহলেসুন্নাত ওয়ালজামাতের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে। তখন আমার মনে হয় আমি আমার একটি অঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি।[১]

(কাওয়ামুস সুন্নাহ) বা হাদীসের অভিভাবক বলে সুপ্রসিদ্ব আল্লামা ইসমাঈল আল আসফাহানী বলেন —

و على المرء محبة أهل السنة في أي موضع كانوا رجاء محبة الله له.... (رواه مالك:١٥٠٣ وأحمد: ٢١٠٢١)

১ আল হুজ্জাতু ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ ২য় খন্ড, ৪৮৭পৃষ্ঠা

একজন ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কর্তব্য হকপন্থী আলেম সমাজকে মুহাব্বত করা। সে যেখানে থাকুক না কেন। এ আশায় যে আল্লাহ তাআলা তাকে মুহাব্বত করবেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: আমার মুহাব্বত তাদের জন্য ওয়াজিব যারা আমার জন্য পরস্পরের সাথে উঠা বসা করে আমার জন্য পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে।[১]

এমনিভাবে একজন ব্যাক্তির অবশ্যই কর্তব্য বিদাআতপন্থীদের ঘৃণা করা, সে যেখানেই থাকুকনা কেন।

যেন সে আল্লাহর জন্য কাউকে মুহাব্বত, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে।[২]

হকপন্থীদের মধ্যে আল-ওয়ালা এর উপস্থিতির কারণ হল, তাদের মানহাজ বা কর্মপন্থা এক, প্রমাণ উপস্থাপন এবং গ্রহণের পথও অভিন্ন। আক্বীদাহ বা ধর্ম বিশ্বাস, শরীয়ত ও আচরণেও তারা একই মত পোষণ করে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আল-ওয়ালা দ্বারা ঈমানের বন্ধন অব্যাহত থাকে এবং স্থায়ী হয়। কারণ আল-ওয়ালা এবং আল-বারা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাআলা হলেন, আলআখির বা যার পর আর কিছু নেই। যার লয় নেই, ক্ষয় নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সম্পর্ক এরূপ হয় না। ঐ সকল সম্পর্ক খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। এবং ইহকাল, পরকাল উভয় জগতে এ সকল বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হতে পারে।

কাফির সম্প্রদায় আমাদের শত্রু

কাফির সম্প্রদায় আমাদের শত্রু অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। চাই তা জাতিগত ভাবে হোক। যেমন: ইহুদী এবং খ্রীষ্টান অথবা স্বধর্মত্যাগী হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ (آل عمران : ٢٨).

মুমিনগণ যেন অন্য মুমিন ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা

১ মালেক: ১৫০৩, আহমাদ: ২১০২১

২ আল হুজ্জাতু ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ ২য় খন্ড, ৪৮৭পৃষ্ঠা

তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা, তার সম্পর্কে তোমাদের সর্তক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[১]

“এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাম ইবনুল কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের নিষেধ করেছেন কাফেরদের পক্ষ সমর্থন করতে। তাদের ভালবাসতে, গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাতে। অত:পর আল্লাহ তাআলা এই বলে অঙ্গীকার করেছেন, যারা এইরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ যে ওয়ালা এবং বারার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লার হুকুম মান্য করেনা, আল্লাহ তাআলা তার কোন দায়ভার নিবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا . (النساء :١٤٤)

অর্থ: হে ঈমানদারগন! তোমরা মুমিনগন ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধু বানিওনা। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দিবে?[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿ألمائدة: ٥١﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।[৩]

এটাই সত্য ও বাস্তবতা যার বিপরীত আজ অবধি লক্ষ্য করা যায়নি। যে কাফের সম্প্রদায় আমাদের শত্রু, আমাদের প্রতিপক্ষ, যা পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত দ্বারা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾ (النساء :١٠١)

---

১ সূরা : আল ইমরান - ২৮

২ সূরা আল নিসা-১৪৪

৩ সূরা : আল মায়েদা- ৫১ (ইবনু কাসীর ১ম খন্ড:৩৫৭)

অর্থ: নিশ্চয় কাফের সম্প্রদায় তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ (التوبة : ١٠)

অর্থ: তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমা লঙ্গনকারী।[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٠٥﴾ (البقرة : ١٠٥)

অর্থ: আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের তাদের মন:পুত নয় যে, তোমাদের পালনককর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।[৩]

আল্লাহ বলেন—

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴿١٠٩﴾ (البقرة : ١٠٩)

অর্থ: আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) দের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত: চায় যে, মুসলমান হবার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রমাণিত হবার পর।[৪]

এইভাবে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের থেকে আমাদের কে সতর্ক করেছেন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ (الملك : ١٤)

অর্থ: তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।[৫]

আপনার হৃদয়কে বুঝানোর জন্য আপনি অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস দেখতে পারেন। দেখতে পাবেন, অতীতে কাফের সম্প্রদায় কি করেছে, বর্তমানে কি করছে

---

১ সূরা : আন নিসা- ১০১
২

৩ সূরা আল বাক্বারা-১০৫
৪ সূরা আল বাক্বারা -১০৯
৫ সূরা আল মুলক-১৪

এবং ভবিষ্যতে তারা কি না করবে? আল্লাহ তাআলা ইমাম ইবনুল কাইয়্যুমকে রহম করুন, যখন তিনি তার কিতাবে বিভিন্ন অধ্যায় করতে লাগলেন, তন্মধ্যে একটি অধ্যায় করলেন এভাবে :

فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم، معاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أوولاهم أمر المسلمين (أحكام أهل الذمة١/ ٢٣٨)

অর্থ: এই অধ্যায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলামানদের সাথে প্রতারণা, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিপদ কামনা, মুসলমানদের কাউকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সম্মানিত অথবা তার বন্ধু অথবা মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর কারণে আল্লাহ তাআলার সাথে দুশমনি সম্বলিত পবিত্র কোরআনের আয়াত প্রসঙ্গে।[১]

আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণীবিভক্তি

ওয়ালাএবং বারার মানদন্ডে মানুষ তিন প্রকার।

(এক) প্রকৃত ঈমানদার এবং সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। আমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে মুহাব্বত করা। তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

(দুই) কাফির এবং মুনাফেক। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে অপছন্দ করা। তাদের থেকে নিরাপদ থাকা।

(তিন) দোষ-ত্রুটি মিশ্রিত। যাদের জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়টা বিরাজ করছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঈমান তাক্বওয়া ও পরহেজগারী অনুপাতে তাদের মুহাব্বত করা। আবার গুনাহে পাপাচারে জড়িত হবার কারণে সে অনুপাতে তাদের অপছন্দ করা এবং বিরোধিতা করা।

কাফিরদের সাথে মুআলাত বা বন্ধুত্বের বিভিন্ন দিক

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের বিভিন্ন শাখা এবং রূপ রয়েছে। আল্লামা আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান এই প্রসঙ্গে বলেন, মুআলাত বা বন্ধুত্ব নামক কাজটি বিভিন্ন মানের হতে পারে।

---

১ আহকামু আহলিজ্জিমা ১ম খন্ড:২৩৮

(এক) বন্ধুত্বটি সমপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বাহির এবং স্বধর্মত্যাগকে অপরিহার্য করে দেয়।

(দুই) বন্ধুত্বটি মানের দিক দিয়ে প্রথমটির চেয়ে নিম্নে, যা দ্বারা হারাম কাজ এবং কবিরা গোনাহে জড়িয়ে পড়ে।[১]

কাফিরদের সাথে যে সব সম্পর্ক স্বধর্ম থেকে বাহির হওয়াকে অপরিহার্য করে দেয়।

(১) তন্মধ্যে মুশরিকদের সমর্থন করা এবং মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের সহায়তা করা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدة : ٥١)

অর্থ: তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অর্ন্তভূক্ত হবে।[২]

(২) আরেকটি হলো কাফেরদের কাফের না বলা। তাদের কুফুরীর ব্যাপারে নিরব থাকা। অথবা সন্দিহান হওয়া। এবং তাদের মতামতকে সবল করা ।[৩]

(৩) এমনিভাবে কুফুরী করার কারণে কাফেরদেরকে মুহাব্বত করা।[৪]

(৪) মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় কামনা করা।[৫]

আল-ওয়ালা এবং আল-বারার বিশ্বাসের উপকারিতা ঃ

এ নীতির উপর অবস্থানের উপকার হল:

(১) ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন, দয়াময় করুনাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা সাফল্য লাভ, এবং মহা প্রতাপশালী আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে মুক্তিলাভ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾. (المائدة : ٨٠-٨١)

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে, তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ

১ আল দুরারুস সুন্নিয়্যাহ:৭ম খন্ড:১৫৯

২ সূরা মায়েদা: ৫১

৩ আশ-শিফা:২য় খন্ড-১০৭১

৪ আল ওয়ালাা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম:২৩১

৫ আল ওয়ালা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম:৬৮

ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এবং চিরকাল তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকড়ো। যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি এবং রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।[১]

(২) বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (الأنفال : ٧٣)

অর্থ: আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তবে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।[২]

আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ মুশরিক থেকে তোমরা সকলে দূরে থাকবে। মুমিনদের বন্ধু বানাবে। না হয় মানুষের মধ্যে ফেৎনা বিস্তার করবে। আর তাহলো কাজ দূর্বোধ্য হওয়া এবং কাফিরদের সাথে মুমিনদের গোলমাল সৃষ্টি হওয়া। এতে করে মানুষের মধ্যে ফাসাদ অরাজগতা দীর্ঘ সময় অবস্থান করে।[৩]

(৩) দুনিয়াতে সচ্ছলতা সমৃদ্ধি অর্জন ও উভয় জগতে সম্মানজনক অবস্থান লাভ।

জনৈক বিদ্ধান বলেন- আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে বর্ননা দিয়েছেন তাতে একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ বলেন-

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾. (مريم:٤٩-٥٠)

অর্থঃ অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সু-খ্যাতি।[৪]

---

১ সূরা : আল মায়েদা-৮০-৮১

২ সূরা আনফাল : ৭৩

৩ ইবনু কাসির ২য় খন্ড: ৩১৬।

৪ সূরা মারয়াম : ৪৯-৫০

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাফের থেকে দূরে থাকা সকল সচ্ছলতা ও সম্মানের কারণ। তিনি আরো বললেন, জেনে রাখুন আল্লাহর শত্রুদের থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা।

এটা আল্লাহর বাণী—

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.

(هود:١١٣) أضواء البيان للشنقيطي: ٢/ ٤٨٥

'আর তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথায় তোমাদের দোযখের আগুন স্পর্ষ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদের কোন সাহায্যও করা হবে না।[১]

এটা সুস্পষ্ট উম্মতের যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ কথায় ও কাজে এই বিষয়টি বাস্তবায়ন করেছেন, আজো আমরা তাদের জন্য দোয়া করি, তাদেরকে ভালো ভাবে স্মরণ করি। এবং সারা জাহানে মানুষের আলোচনায় ভালো হিসাবেই আলোচিত হয়। আল্লাহর সাহায্য এবং পরিণতিতে তাদের বিজয় তো আছেই।

আমিরুল মোমিনীন আবু বকর রা. এর অবস্থানকে চিন্তা করুন। তিনি ধর্মত্যাগী ও জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যখন অবস্থান নিলেন আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন এবং তার এই পদক্ষেপের উসিলায় দ্বীনে ইসলামকে শক্তিশালী করলেন।

আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর অবস্থান দেখুন: তিনি বেদআতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। তিনি তাদের সাথে তেল মাখামাখি করেননি, আপোষ করেননি, ও নিজ অবস্থান থেকে একটুও নড়েননি। আল্লাহ তাআলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে বিজয় দান করেন। বাতিলকে পরাজিত করেন।

মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়্যুবীর অবস্থান লক্ষ করুন। তিনি মুসলমান জাতির এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন। এ রকম উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে।

কুফুর এবং কাফিরদের পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত

[১] সূরা হুদ : ১১৩

আল্লাহ তাআলা এই মহা ঐতিহ্য, এবং এই ক্ষেত্রে তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণ তার আদেশ কিভাবে কার্যকর করেছেন, তা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী-

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ (الانعام: ١٩)

'আপনি বলে দিন তিনি একমাত্র উপাস্য। আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত।[১]

ইব্রাহিম আ: সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾الأنعام: ٧٨)

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে সব বিষয়কে শিরক কর, আমি ঐ সব থেকে মুক্ত।[২]

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهَّ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهَّ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾. (الممتحنة: ٤)

'তোমাদের জন্য ইব্রাহিম এবং তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিম এর উক্তিঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমারা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি। আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট।[৩]

অতএব মুসলমানদের জন্য ইব্রাহিমের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে এবং তার মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি আর কাফের ও

---

১ সূরা আল আনআম-১৯

২ সূরা আল আনআম:৭৮

৩ সূরা আল মুমতাহিনা- ৪

মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ক্ষেত্রে। শুধু মাত্র একটি বিষয় ব্যতীত, আর তা হল ইব্রাহিম আ: তার কাফের পিতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হবে না। অন্য আয়াতে ইব্রাহিম আ: তার পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. (التوبة: ١١٤)

অর্থ: আর ইব্রাহিম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অত:পর যখন তার কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ তাআলার শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নি:সন্দেহে ইব্রাহিম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।[১]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আ. আল-ওয়ালা এবং আল-বারাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করেছেন। এমনকি যখন তার নিকট পরিষ্কার হল যে তার পিতা আল্লাহ তাআলার শত্রু তৎক্ষনাত তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾ (هود: ٣٥)

'তারা কি বলে, আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার উপর বর্তাবে। আর তোমরা যে সব অপরাধ কর, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[২]

প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা শেখ সাআদী ক্বালেন, এই আয়াত দ্বারা নূহ আ. ও উদ্দেশ্য হতে পারেন। এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. ও উদ্দেশ্য হতে পারেন।[৩]

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে মুসা আ. এর শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

১ সূরা আত তাওবাহ-১৪৪

২ সূরা হুদ-৩৫

৩ তাইসিরুল কারিমির রাহমান- ৩৮১

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ. (طه: ٣٩)

'যে তুমি মুসাকে সিন্দুকে রাখ, অত:পর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। অত:পর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নিবে।[১]

এরকমই ছিল পূর্বেকার নবী রাসূল আ. দের বৈশিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴿٩٠﴾ (الانعام: ٩٠)

এরা এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরন করুন।[২]

এমনিভাবে আল-ওয়ালা এবং আল-বারা বাস্তবায়নে মুহাম্মদ সা. এর গৌরবময় জীবনীতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ٢٩)

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরষ্পর সহানুভুতিশীল।[৩]

তিনি ছিলেন, অনুকম্পার নবী, বীরত্বের নবী। হ্যাঁ মোমেনদের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾التوبة: ١٢٨)

'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।[৪]

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী রা. বলেন, আমরা সকাল বেলা রাসূল সা. এর নিকট অবস্থান করেছিলাম। ইতিমধ্যে নগ্ন পা, প্রায় উলঙ্গ এবং গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে মুযার গোত্রের সকল লোক অথবা বেশীর ভাগ নবী সা. এর কাছে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাদের মধ্যে অভাব অনটন লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে গেলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন, আবার বের হলেন। এর মধ্যে সালাতের সময় হলে বিলাল রা. কে

১ সূরা ত্বোহা-৩৯

২ সূরা আল আনআম-৯০

৩ সূরা আল ফাতহ-২৯

৪ সূরা : আত তাওবা-১২৮

আযানের আদেশ দিলেন। এবং সালাত কায়েম করে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে এই মর্মে ভাষণ দিলেন, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন করে থাক এবং আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তাআলা কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। কোন ব্যক্তি দিনার, কোন ব্যক্তি দিরহাম, কেহ কাপড় কেহ গম কেহ খেজুর দান করলেন। নবী সা. বললেন, খেজুরের অংশ বিশেষ হলেও দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবীও খাদ্যের এক স্তুপ যা বহন করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল, নিয়ে হাজির হলেন। অত:পর ধারাবাহিকভাবে মানুষ আসতেই থাকল। আমি খাদ্যের একটি এবং কাপড়ের একটি টিলা নবীজির সামনে দেখতে পেলাম। নবীজির মুখমন্ডল দেখলাম যেন স্বর্ণের পলকে আলোকিত হয়ে গেল। অত:পর রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতি প্রবর্তন করে, এই জন্য সে সাওয়াব পাবে। এবং তার পর তার এই রীতি অনুযায়ী কেহ কাজ করলে ঐ সাওয়াবও সে পাবে। তবে তাদের সাওয়াব হতে নূন্যতম কমানো হবে না।[১]

আল্লামা নববী রাহঃ বলেন, নবী সা. খুশি হবার কারণ হল, সাহাবাদের দ্রুত আল্লাহর অনুগত্য করা, আল্লাহর জন্য তাদের সম্পদ দান করা, আল্লাহর রাসূলের আদেশ পালন করা, আগত অভাবী লোকদের অভাব দূর করা, মুসলমানেরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং ভাল ও নেককাজে সহায়তা করা, মানুষের উচিত এই জাতীয় কোন কিছুতে দৃষ্টি পড়লে খুশি হওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা, এবং মানুষের খুশি-আনন্দ উল্লেখিত কারণেই হওয়া উচিত। আর আল্লাহর শত্রুদের সাথে এবং নবী সাঃ এর দুশমনদের সাথে ঘৃণা প্রকাশ করা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তার নবী এবং তার অনুসারী সাহাবীদের সম্পর্কে বলেনঃ

১ মুসলিম -১০১৭

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (الفتح : ٢٩)

'তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ। যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর তা শক্ত ও মজবুত হয়। এবং কান্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে। চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরষ্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।[১]

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূল সা. যে সকল উট যবেহ করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল আবু জাহেলের। উদ্দেশ্য ছিল তার মাধ্যমে মুশরিকদের অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি করা। আর এই উট বদর যুদ্ধে নবী সা. যুদ্ধলভ্য সম্পদ হিসাবে পেয়েছিলেন।[২]

এই ঘটনা হতে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম উদ্ভাবন করেছেন, আল্লাহ তাআ'লার শত্রুদের সাথে ক্রোধান্বিত হওয়া উত্তম।[৩]

উদ্দেশ্য হল আমরা নবী সা. এর নির্দেশনায় ব্যাপক এবং সার্বিক দিকে দৃষ্টি দিব। তিনি শুধু রহমতের নবী, উদারতার নবী, হৃদ্যতার নবী বলে আমরা মনে করবো না, তেমনি তার বিপরিতও মনে করবো না। বরং তার পবিত্র জীবনী হতে আমরা উভয় দিক গ্রহণ করব। এবং আল-ওয়ালা এবং আল-বারাকে প্রকৃত রূপ দান করবো। অনুরূপভাবে এই নীতি আমাদের জীবনে এড়াং মানুষের মধ্যে বিশ্বাসে, কথায়, কাজে আমরা বাস্তবায়ন করবো। আর এটা সম্ভব হবে, আল্লাহর কিতাব এবং নবী সা. এর সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে। ইতিহাস অধ্যয়ন করা, হক্ব এবং বাতিলের সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করা, এই উম্মতের পরিচয় এবং ধর্মকে নি:শেষ করার শত্রুদের প্রতারণা ও চক্রান্ত উদঘাটন করা। আল-ওয়ালা এবং আল-বারাকে প্রকৃত রূপদানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহর পথে দান করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বা হক্বপন্থি লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক তাদের খোজ-খবর নেয়া।

---

১ সূরা আল ফাতহ-২৯

২ যাদুল মাআ'দ ১ম খন্ড:১৩৪

৩ যাদুল মাআ'দ ২য় খন্ড-৩০১

শেষ দিবস

শেষ দিবস বা মহাপ্রলয় দিবস। যে দিবসে আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য পুনরুত্থিত করবেন। শেষ দিবস বলার কারণ হলো এর পর আর কোন নতুন দিবস উদয় হবে না। জান্নাতবাসী আর জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ অবস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

শেষ দিবসের উপর ঈমান বলতে বুঝায় ঃ

কিয়ামত দিবসে যে সকল বিষয় সংঘটিত হবে সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন। যেমন: পুনরুত্থান, পুনর্জীবন, হিসাব, মিজান বা পাল্লা, পুলসিরাত এবং মহাপ্রলয়ের পূর্বে মৃত্যু, কবরে প্রশ্ন, কবরজীবন, মহাপ্রলয়ের পরে জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থান।

আখেরাতের যেসব বিষয় সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সাধারণ ভাবে এবং সে সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে সে গুলো বিস্তারিত ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন: কবর আযাব, সিংগায় ফুঁক, হাসর মাঠে মানুষ জামায়েতের ধরন, মিজান, সিরাত ইত্যাদি।

কুরআনুল করিম ও হাদীস শরীফে গায়েব বিষয় বর্ণনা এসেছে যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿البقرة: ٢-٥﴾

এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা গায়েব বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যায় করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর

আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।[১]

শেষ দিবসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক) ألموت : মৃত্যু :

মৃত্যু পরকালের মঞ্জিল বা পান্থনিবাস গুলোর মধ্যে প্রথম। যদিও মৃত্যু আমার সামনেই ঘটে কিন্তু বাস্তবতা হলো রূহ বাহির হওয়ার ধরন মৃতের সাথে ফেরেস্তাদের কথোপকথন এবং মৃতের সামনে তার পরিতাপ অথবা সম্মানিত হওয়া ইত্যাদি সবই অদৃশ্য বিষয়।

মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন বলতে বুঝায়ঃ

* বিশ্বাস করা যে সকল সৃষ্টির জন্য মৃত্যু অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ الرحمن

ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানূভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।[২]

* প্রত্যেকের মৃত্যু নির্ধারিত সময় হবে ব্যত্যয় হবে না। আল্লাহ বলেন—

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِّ كِتَابًا مُؤَجَّلًا (آل عمران: ١٤٥)

অর্থঃ আল্লাহর আদেশ ব্যতিত কারো মৃত্যু হবে না এর জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।[৩]

* এ নির্ধারিত সময় আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেহ জানে না। আল্লাহ বলেন-

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. (لقمان: ٣٤)

কেউ জানেনা আগামী কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে।[৪]

* মৃত্যুকে স্মরণ ও অন্তরে কল্পনা করা ঃ

---

১ সূরা : বাক্বারা: ২-৫

২ সূরা : আর-রাহ্মান-২৬-২৭

৩ সূরা : আল-ইমরান-১৪৫

৪ সূরা : লোকমান- ৩৪

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. (رواه الترمذي:٢٢٢٩)

স্বাদ, সুখ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।[১]

* সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মৃত্যুর পুর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ। আল্লাহ বলেন-

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿الشورى:٤٧﴾

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালন কর্তার আদেশ মান্য কর যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না।[২]

খ)...سوال القبر কবরে জিজ্ঞাসা পরীক্ষা শাস্তি ও পুরস্কার:

বারাা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (إبراهيم:٢٧)

আল্লাহ মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।[৩]

আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে:

فيقال له: من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلي الله عليه وسلم

অর্থ : মৃত ব্যাক্তিকে প্রশ্ন করা হবে তোমার প্রভু কে ? সে উত্তর বলবে আমার প্রভু আল্লাহ, আমার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এটাই আল্লাহর বাণী- يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (مسلم:٥١١٧) দ্বারা উদ্দেশ্য।[৪]

আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের গোত্রীয় লোকজন সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলেন-

---

১ তিরমিজী : ২২২৯

২ সূরা : আশ শুরা- ৪৮

৩ সূরা : ইব্রাহীম - ২৭.

৪ মুসলিম: ৫১১৭

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

﴿ألغافر:٤٦﴾

'সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।[১]

قال صلي الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي وإلا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإلا كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. (البخاري: ١٢٩٠)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মানুষের মৃত্যুর পর সকাল সন্ধ্যা তার অবস্থানকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। জান্নাতবাসী হলে জান্নাতকে আর জাহান্নামবাসী হলে জাহান্নামকে। অতঃপর বলা হয় কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থনের পর এ হবে তোমার আবাসস্থল।[২]

(গ) يوم القيامة মহা প্রলয় দিবস

(১) কিয়ামতের আলামত দুই প্রকার (১) ছোট আলামত (২) বড় আলামত

ছোট আলামত কিছু প্রকাশ পেয়েছে।

* নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন, যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة (البخاري:٢٠٢٣ و مسلم:١٤٣٥)

অর্থ : আমি প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামত সংঘটিতেরমধ্যে এ দুটিরমত দূরত্ব এবং তিনি শাহাদাত আঙ্গুলির দিকে ঈঙ্গিত করলেন।[৩]

أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشوا الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال (البخاري:٤٨٣٠ مسلم:٤٨٢٥)

---

১ সূরা : গাফের-৪৬

২ বুখারী-১২৯০

৩ বুখারী-২০২৩, মুসলিম-১৪৩৫

প্রকৃত জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি, ব্যাভিচারের ব্যাপকতা, মদ্যপান, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে মাত্র একজন পুরুষ।[১]

* আমানত ধ্বংস

ধ্বংসের ব্যাখ্যায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة . (البخاري:٦٠١٥)

অর্থ: যদি নেতৃত্ব অযোগ্য লোককে দেয়া হয় তবে কিয়ামতের অপেক্ষা কর।[২]

*প্রতিমার উপাসনা

عبادة الأوثان فى هذه الأمة وكثرة الزلال وتقارب الزمان. (البخاري)

প্রতিমার উপাসনা, অধিকহারে ভূমিকম্প, সময় খুব কাছাকাছি মনে হওয়া।[৩]

*ইহুদীদের সাথে লড়াই

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر.. (مسلم: ٥٢٠٣)

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানগন ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলিমগণ ইয়াহুদীদের হত্যা করবে এমন কি এ লড়াইয়ে ইহুদী মুসলিম আতংকে গাছ ও পাথরের আত্মগোপন করেও শেষ রক্ষা পাবে না। গাছ মুসলিমকে বলে দিবে আমার পেছনে ইহুদী আত্মগোপন করে আছে তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ বলবেনা।[৪]

কিয়ামতের বড় আলামত

হুযায়ফা বিন উসাইদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা আলোচনা করছিলাম ইতো মধ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন: তোমরা কি আলোচনা করছ? আমরা বললাম কিয়ামত বিষয়, তিনি বললেন-

---

১ বুখারী:৪৮৩০- মুসলিম:৪৮২৫

২ বুখারী-৬০১৫

৩ বুখারী

৪ মুসলিম : ৫২০৩

إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. দশটি বস্তু দেখা ছাড়া কেয়ামত সংঘটিত হবে না। দুখান বা ধুঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাহ, (জন্তু বিশেষ) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনে মারয়ামের আগমন, ইয়াজুজ মাজুজ, তিনটি ধস; পূর্বে ধস, পশ্চিমে ধস, জাজিরাতুল আরবে ধস, ইয়ামেন থেকে আগুন প্রকাশ যা মানুষে তাড়া করে মাহশারে (জমায়েতের স্থান) নিয়ে যাবে।[১]

ধারাবাহিক ভাবে কিয়ামতের বড় আলামত (আল্লাহই ভালো জানেন) নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রতীক্ষীত মাহদীর প্রকাশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يخرج في أخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانية (الحاكم وصحيح الالباني اسناده)

আমার উম্মতের শেষ পর্যায় 'মাহদী' আসবে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিয়ে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। জমিনে প্রচুর ফলন হবে, সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপকহারে জন্মাবে গবাদি পশু, বৃদ্ধি পাবে উম্মতের মান-মর্যাদা, সাত অথবা আট বছর এ অবস্থা বহাল থাকবে।[২]

(২) দাজ্জালের প্রকাশ (ইহা এক মহা ফিৎনা) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء بمثل الجنة والنار فالتي يقول إ نها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. (البخاري كتاب الفتن: و مسلم: ٥٢٢٧)

অর্থঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বলবোনা? যে সম্পর্কে কোন নবী তার জাতিকে বলেননি, সে হবে এক চক্ষুহীন, সে জান্নাত, জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখাতে সক্ষম হবে, সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটিই হবে জাহান্নাম। নূহ তার জাতিকে যেভাবে সতর্ক করেছে আমিও তোমাদের অনুরূপ সতর্ক করছি।[৩]

দাজ্জালের ফেৎনা হতে মুক্তির জন্য সূরা কাহফের প্রথম অথবা শেষ দশ আয়াত হেফজ করা।

---

১ মুসলিম

২ হাকেম

৩ মুসলিম-৫২২৭

(৩) ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ

দাজ্জালের পর তিনি আগমন করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. (البخاري:٣١٩٢)

যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, অচিরেই ঈসা ইবনে মারইয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবে ন্যায় বিচারক ও শাসক হিসাবে, ক্রুশ ভাঙ্গবে, শুকর হত্যা করবে, খাজনা-ট্যাক্স বাতিল করবে, সম্পদ এতো বেশি পরিমানে বৃদ্ধি পাবে যে কেহ কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবে না। ঐ সময়কার একটি সেজদার মূল্য দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশী হবে।[১]

(৪) ইয়াজুজ মাজুজের প্রকাশ : তারা ঈসা ও ঈমানদারদেরকে তুর পাহাড়ে আবদ্ধ করে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজু মাজুজকে ধ্বংস করবেন, পাখি প্রেরণ করে তাদের উপর নিক্ষেপ করবেন, তার ইচ্ছানুযায়ী বারি বর্ষণ করবেন, জমিনের বরকত প্রকাশ পাবে। অতঃপর একটি পবিত্র বাতাস পাঠিয়ে মুমিনদের আত্মগুলোকে মৃত্যু দিবেন। যাতে কিয়ামত দোষীদের উপর সংঘটিত হয়।

(৫) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঃ

আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. (ألأنعام: ١٥٨)

'যে দিন আপনার পালন কর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফল প্রসূ হবে না, যে পূর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন রূপ সৎকর্ম করেনি।[২]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

১ বুখারী : ৩১৯২

২ সূরা : আল-আনআম- ১৫৮

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أمنوا أجمعون وذلك حتى لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية. (البخاري:٤٢٩٦ و مسلم:٦٠٢٥ نحوه)

'পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিয়ামত সংঘঠিত হবে না। যখন পশ্চিমাকাশে উদিত হবে মানুষ তা অবলোকন করবে, সবাই ঈমান কবুল করবে, কিন্তু এটা এমন সময় যখন ঈমান কোন উপকারে আসবে না। অতঃপর তিনি

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (ألأنعام: ١٥٨)

'যে দিন আপনার পালন কর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফল প্রসূ হবে না, যে পূর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন রূপ সৎকর্ম করেনি।'

আয়াতটি পাঠ করলেন।[১]

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. (مسلم:٤٨٧٢)

পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন।[২]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেন—

أن أول الأيات خروجا طلوع الشمس من مغربها و خروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا منها. (مسلم:٥٢٣٤)

'কিয়ামতের প্রথম দিকে প্রকাশিত আলামতের মধ্যে পশ্চিামাকাশে সূর্যোদয়, সকাল বেলা দাব্বাতুল আরদ (যার প্রকৃতি আল্লাহই ভালো জানেন) এর প্রকাশ, এর মধ্যে যেটিই আগে হোক এর কিছু পরে দ্বিতীয়টি ঘটবে।[৩]

(৬) দাব্বাতুল আবদের প্রকাশঃ তার প্রকৃতি আল্লাহই ভালো জানে, আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿النمل: ٨٢﴾

---

১ বুখারী-::৪২৯৬মুসলিম: ৬০২৫

২ মুসলিম : ৪৮৭২

৩ মুসলিম: ৫২৩৪

'যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। একারনে যে মানুষ আমার নিদর্শণসমূহ বিশ্বাস করত না।[১]

(৭) অগ্নিৎপাত : কা'য়ারে আদন থেকে আগুন বাহির হবে। আগুন মানুষকে একটি স্থানে নিয়ে একত্রিত করে ফেলবে এ আলামত প্রকাশ হওয়ার পর দুনিয়াতে আর কোন আলামত প্রকাশ হবে না। এটা শেষ হলেই সিংগায় ফুঁক হবে।

সিংগায় ফুক:

ফুঁক দিবেন ফিরিশ্‌তা ইস্রাফিল। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তিনি সিংগায় ফুঁক দিবেন তিনবার।

(২) نفخة الفزع ভীত বিহবল ফুঁক।

যার বর্ণনা সূরা আন-নমলে এসেছে, আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ (النمل: ٨٧)

যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যারা আছে তারা ভীতবিহবল হয়ে পড়বে।[২]

২) সংজ্ঞাহীনতার ফুক ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ .(الزمر: ٦٨)

'সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন।'[৩]

এই ফুৎকারের মাধ্যমে সব কিছু ধ্বংস ও সকল জীবের মৃত্যু হবে এক মাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া।

(৩) পূণরুত্থানের ফুঁক:

এ ফুঁকে মানুষ কবর হতে উঠবে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿ الزمر: ٦٨ ﴾

অতঃপর আবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।[১]

---

১ আন নামল- ৮২

২ সূরা : আন-নামল : ৮৭

৩ সূরা : আযযুমার : ৬৮

শেষ দুই ফুঁকের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্কে রাসূলের হাদীসে বর্ণনা এসেছেঃ ما بين النفختين أربعون (متفق عليه) দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান চল্লিশ"[২] তবে চল্লিশবছর মাস দিন এ রকম কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই এ বিষয় আল্লাহ ভালো জানেন।

(৩) হাশর ঃ মানুষ কবর থেকে দন্ডায়মান হওয়ার পর আরদে মাহশার (জমায়েতের স্থান) এর দিকে নিয়ে যাওয়ার নাম হাশর।

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ كهف:٤٧﴾

'আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।'[৩]

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠الواقعة﴾

'বলুন; পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।'[৪]

দন্ডায়মানের সময় মানুষ প্রতক্ষ্য করবে যে তারা পরিবর্তিত পৃথিবীতে অবস্থান করছে।

আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ إبراهيم

'যে দিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং মানুষ পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে।[৫]

এখানেই মানুষ অপেক্ষা করবে সিদ্ধান্ত ও রায়ের জন্য। এ স্থানেই হবে রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত- শাফাআতে উজমা এই শাফাআতই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

(৪) العرض আল-আরদু বা উপস্থাপন:

উপস্থাপন দুই রকমের হবে

(ক)সকল মাখলুককে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হবে। কারো হিসাব হবে, জিজ্ঞাসাবাদ হবে আবার অনেকের হবে না।

---

১ সূরা : যুমার : ৬৮

2 মুত্তাফাকুন আলাইহি

৩ কাহাফ : ৪৭

৪ সূরা : ওয়াক্বিয়া - ৪৯-৫০

৫ ইব্রাহীম : ৪৮

আল্লাহ বলেন-

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (ألكهف: ٤٨)

‘তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবে তোমরা আমার কাছে এসে গেছ যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।[১]

(খ) শুধু সহীফায়ে আমল বা আমলনামা উপস্থাপন : আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ (ألإنشقاق: ٨-٦)

‘হে মানুষ তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হয়ে যাবে।[২]

আয়েশ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك قالت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال: إنما ذلك العرض ليس أحد يناقش الحساب إلا عذب.(البخاري: ٦٠٥٦)

‘কিয়ামতে যার হিসাব হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। আয়েশা বললেন: আল্লাহ কি বলেননি যে, হিসাব সহজ হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এটা হলো উপস্থাপন মাত্র। যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার শাস্তি অনিবার্য।[৩]

(গ) জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে প্রদর্শন এবং কাফেরদেরকে জাহান্নাম প্রদর্শন। আল্লাহ বলেন

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا . (ألأحقاف: ٢٠)

যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই শেষ করেছ।[৪]

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ ألكهف

১ সূরা : কাহফ - ৪৮

২ সূরা : ইনশিক্বাক্ব- ৬-৮

৩ বুখারী : ২০৫৬

৪ সূরা : আহক্বাফ- ২০

অর্থঃ সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব।[১]

রাসূল সলালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন-

يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.

(مسلم:٥٠٧٦)

জাহান্নামকে সত্তর হাজার লাগামসহ উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকবে, তারা জাহান্নামকে টেনে আনবেন।[২]

(৫) জিজ্ঞাসা ঃ

হাসরের পর হবে জিজ্ঞাসা পর্ব, রাসূলগণও তাদের উম্মতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত সম্পর্কে, জিজ্ঞাসা করা হবে উম্মতদেরকেও, আল্লাহ বলেন-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الأعراف:٦ ﴾

'আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূল গণকে।'[৩]

আল্লাহ বলেন —

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ألحجر:٩٢ ﴾

'অতএব আপনার পালন কর্তার কসম আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।'[৪]

এ জিজ্ঞাসাবাদ হলো সিদ্ধান্ত নেয়া ও নথিভূক্ত করার জন্য। অন্য আয়াতে এসেছে কাফেরদের জিজ্ঞেস করা হবে না। উভয় আয়াতের সমাধান হলো কিয়ামতে অনেক গুলো অবস্থান হবে, কোনটিতে জিজ্ঞেস করা হবে কোনটিতে হবে না।

৬) হিসাব: হিসাব হলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে সৃষ্টিজগতের কৃতকর্মের ভালোমন্দের নির্দিষ্টকরণ এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে তাদের ভুলে যাওয়া আমল কে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ (المجادلة:٦)

---

১ সূরা : কাহফ- ১০০

২ মুসলিম : ৫০৭৬

৩ সূরা : আল-আরাফ- ৬

৪ সূরা : হিজর- ৯২

'যে দিন আল্লাহ তাআলা সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অত:পর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ তাআ'লা তার হিসাব রেখেছেন। আর তারা তা ভুলে গেছে।'[১]

হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মুমিনদের দুই ভাগ করা হবে।

(১) বিনা হিসাব এবং বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটি সত্তর হাজার এবং তাদের মতো আরো যারা আছে তাদের সম্পর্কে হাদীসে প্রমাণ আছে।

(২) যাদের হিসাব হবে, এরা হল যাদের নেক আমল ও বদ আমলে মিশ্রণ হয়েছে।

আর কাফিরদের হিসাব, তাদের কাছে তাদের আমল উপস্থিত ও তাদেরকে ভৎসর্না করার মাধ্যমে হবে। আর এ হিসাব হবে তাদের শাস্তির স্তর বর্ণনার জন্য। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য নয়।

(৭) মিজান বা পাল্লা:

মিজান দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ মিজান যা দাঁড় করানো হবে কিয়ামত দিবসে বান্দার আমলসমূহ মাপা এবং পৃথক করার জন্য। মাপ হবে হিসাবের পর। মাপ হবে আমলের পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য। যাতে ঐ অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿أنبياء:٤٧﴾

'আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ঠ।[২]

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ أعراف

১ সূরা : মুজাদালাহ - ৬

২ সূরা আম্বিয়া- ৪৭

'আর সেইদিন যথার্থই ওজন হবে। অত:পর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।'[১]

বিশুদ্ধ কথা হল, ছহিফায় আমল বা আমলের পুস্তিকা তথা মানুষের সকল কর্ম পাল্লাতে মাপা হবে। হাদীস দ্বারা এমনই প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৮) আমলের ছহীফা

হিসাব এবং মিজানের পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের পুস্তিকা দেওয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীতে তার সকল কর্মের প্রতিবেদন পাবে ও তা গ্রহণ করবে। এবং তা পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ إسراء

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ।[২]

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ الحاقة

'অত:পর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।[৩]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ الحاقة

'যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমার যদি আমলনামা না দেওয়া হত, আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব।[৪]

১ সূরা আরাফ: ৮-৯

২ সূরা : বনি ইসরাইল :১৩-১৪

৩ সূরা হাক্কাহ: ১৯-২১

৪ সূরা হাক্কাহ:২৫-২৬

অত:পর প্রত্যেকে আপন গন্তব্যের দিকে যাবে। যাদের আমলনামা ডান হাতে তারা জান্নাতে আর যাদের আমলনামা বাম হাতে তারা আগুনের দিকে। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি পারাপার হতে সিরাতের উপর দিয়ে।

(৯) আসসিরাত বা সেতু:

এটা হলো জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতু। যার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকলে। যে অতিক্রম করতে পারবে সে আগুন থেকে নিরাপদ থাকল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ......(البخاري: ٦٨٥٨)

'জাহান্নামের উপর সেতু নির্মিত হবে। আমি আর আমার উম্মতই প্রথমে এই সেতু অতিক্রম করবো। ঐ দিন রাসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না। ঐ দিন রাসূলদের আহ্বান হবে শুধু সাল্লিম, বা শান্তি, রক্ষা কর। জাহান্নামের মধ্যে কালালিব থাকবে সুউদানুনের কাটার মত। সুউদানুন কি দেখেছো ? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। নবী সা. বললেন, কালালিব হচ্ছে, সুউদানুনের কাটার মত। তবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া তার সংখ্যা কত অন্য কেউ বলতে পারবে না। ভয়াবহ সিরাত থেকে মানুষ উদ্ধার হবে একমাত্র তার আমল দ্বারা।[১]

كلاليب কালালিব كلوب কুলুব-এর বহুবচন। অর্থ: মাথা বাকাঁনো লোহা বা লোহার হুক।

'সুউদান' একপ্রকার উদ্ভিদ, যার বড় বড় কাঁটা রয়েছে।

অন্য হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'ঈমানদারগণ চোখের পলকের মত, বিজলির মত, বাতাসের মত, পাখীর মত, দ্রুতগামী ঘোড়ার মত পার হতে থাকবে। কতিপয় নিরাপদে মুক্তি পাবে। কতিপয় আঘাতপ্রাপ্ত হবে, আর কতিপয় জাহান্নামে পতিত হবে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমার কাছে এই বার্তা এসেছে যে, সেতুটি চুল থেকেও চিকন আর তরবারীর চেয়েও ধার। এই জাতীয় বিষয়ে নিজেদের মনমত কোন কথা বলা যাবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়ার অবস্থা এবং তার বিধানের চেয়ে

১ বুখারী : ৬৮৫৮

আখেরাতের বিষয় সম্পুর্ণ ভিন্নতর। আখেরাতের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট ও অবস্থা আছে, যা দুনিয়ার মধ্যে নেই। আর দুনিয়াতেও অনেক আশ্চর্য বিষয় আছে, যেমন শুন্যে পাখীর উড্ডয়ন এবং পানির উপর অবস্থান, এগুলো আশ্চার্যজনক হলেও মানুষ তা বিশ্বাস করে। আর আল্লাহর কুদরত এত যে কোন মাখলুক তা আয়ত্ত করতে অক্ষম।

(১০) আল ক্বানতারাহ: জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতুর ভয়াবহতা থেকে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের মুক্তি দেয়ার পর তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যখানে ক্বানতারা বা পুলের উপর অবস্থান করবে। সেখানে একে অপর থেকে প্রতিশোধ নিবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارفيقضي لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنـزله في الجنة منه بمنـزله كان في الدنيا. (البخاري:٦٠٥٤)

‘আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। অত:পর আটক করবেন জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে ক্বানতারর উপর। এতে একে অপর থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নিবে, যা তাদের মধ্যে দুনিয়াতে ছিল। এরপর তারা যখন নির্মল এবং মার্জিত হবে তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যে জাতে পাকের হাতে মুহাম্মদের জীবন, তার শপথ করে বলছি, তাদের জন্য জান্নাতে এতটুকু স্থান দুনিয়া হতে অনেক শ্রেষ্ঠ।[১]

এসব মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকা ও দুনিয়াতেই হক্বদারের হক্ব আদায়ের দিকে আহবান জানায়।

(ঘ) জান্নাত এবং জাহান্নাম

এই হল সকল গন্তব্যের শেষস্থান। জান্নাত হলো সম্মানের সর্বোচ্চ স্থান। জাহান্নাম হলো পরিতাপের স্থান। উভয়টি বিদ্যামান আছে। প্রত্যেক স্থানের অধিবাসী সেখানে থাকবে চিরকাল। চির জীবন পাবে, মৃত্যু তাদের স্পর্শ করবে না। মুসলমান পাপী লোক জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, তাদের গোনাহ অনুযায়ী। যদি আল্লাহ তাদের ক্ষমা না করেন। অত:পর মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। জান্নাত-জাহান্নামের বৈশিষ্টের উপর কোরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে, যা সকল মুসলমান জানেন। এরপরও বলতে হয় জান্নাতে আল্লাহ অকল্পনীয় নেয়ামত

১ বুখারী : ৬০৫৪

রাজী রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন,

أعدت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولاخطرعلى قلب بشر...

(البخاري: ٣٠٠٥)

'আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করেছি, যা তাদের চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি। কোন মানুষ অন্তরে কখনো কল্পনাও করেনি।' তোমাদের ইচ্ছা হলে পড়-

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (ألسجدة:١٧)

"কেউ জানেনা তার কৃতকর্মের জন্য কি কি নয়নপ্রীতিকর প্রতিদান লুকায়ীত আছে।"[১]

আর জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই সম্পর্কে নবী সা. এর একটি হাদীস যথেষ্ঠ। যাতে বলা হয়েছে :

إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل

، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. (مسلم:٣١٤)

'জাহান্নামের শাস্তির দিকে দিয়ে সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যার পায়ে আগুনের দুইটি পাদুকা ও ফিতা হবে। সেগুলোর তাপে তার মস্তিষ্ক উথলিয়ে যাবে। যেমনিভাবে কড়াইয়ে খাদ্য টগবগ করে ফোটে। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কারো হচ্ছে বলে মনে হবে না। অথচ জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি হচ্ছে সহজতর শাস্তি।[২]

আজাব এবং পুরষ্কার উভয়কে অনুমান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসটি একটু চিন্তা করি,

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا بن آدم هل مر بك

نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة

---

১ সূরা সেজদা: ১৭, বুখারী: ৩০০৫

২ মুসলিম : ৩১৪

في الجنة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مربك من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي من شدة قط. (مسلم:٥٠٢١)

'দুনিয়াতে সবচে সুখী ব্যক্তি, অথচ আজ সে জাহান্নামী। তাকে উপস্থিত করা হবে। আর জাহান্নামে একবার মাত্র তাকে চুবানো হবে। অত:পর জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার উপর কি সুখের কোন কাল অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে, না, হে আল্লাহ! কখনো অতিবাহিত হয়নি। অত:পর দুনিয়াতে সবচে বেশী দূদর্শা, অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি আজ সে জান্নাতি তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাতের মধ্যে একবার মাত্র আবগাহন করানো হবে। অত:পর তাকে জিজ্ঞেসা করা হবে হে বনী আদম! তোমার উপর কি দু:খের কোন কাল অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে, হে আল্লাহ! না দু:খ আমাকে কখনো স্পর্শ করেনি। আর আমি কখনো দু:খ দেখেনি।[১]

১ মুসলিম : ৫০২১

ইসলামে ইবাদাত
অর্থ রুকন ও শর্ত

জ্বীন-ইনসান সৃষ্টির তাৎপর্য

আল্লাহ তাআলা বাতিল বা নিরর্থক বিষয় থেকে পবিত্র। আল্লাহ বলেন–

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ الحجر: ٨٥ ﴾

আমি নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি।[১]

আল্লাহ বলেন–

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ ص:٢٧﴾

আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব কাফেরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।[২]

এজন্য আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি জ্বীন-ইনসানকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ বলেন—

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾المؤمنون:١١٥﴾

‘তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?[৩]

বরং আল্লাহ তাআলা তাদের সৃষ্টি করেছেন মহৎ লক্ষ্যে ও বিরাট তাৎপর্যের উদ্দেশ্যে। যা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা তার বাণীতে বলেছেন,

---

১ সূরা হিজর-৮৫

২ সূরা : ছোআ’দ:২৭

৩ সূরা : মুমিনুন :১১৫

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿الذاريات: ٥٦-٥٨﴾

'আমার ইবাদাতের জন্যই আমি মানব ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তাআলাইতো জীবিকা দাতা শক্তির আধার,পরাক্রান্ত।'[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة:٢١﴾

'হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারবে।'[২]

ইবাদতের অর্থ

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ: অনুগত হওয়া, নত হওয়া, অনুসরণকরা। পারিভাষিক অর্থ: ঐ সকল কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। তা প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে।

প্রকাশ্য কথা : যেমন: কালেমা উচ্চারণ করা, দোয়া, যিকির, ইস্তেগফার ইত্যাদি।

গোপনীয় কথা : আত্মার সত্যায়ন ও যে সব বিষয় আত্মার স্বীকৃতি প্রয়োজন সে সব বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা। যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানি কিতাবসমূহের উপর ঈমান, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, শেষ দিবস ও তাক্বদীরের ভালোমন্দের উপর ঈমান আনায়ন করা।

প্রকাশ্য কাজ : যেমন: সালাত কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা, হজ্ব এবং জিহাদ করা, অত্যাচারীতের সাহায্য করা ইত্যাদি।

গোপনীয় কাজ : ইখলাস, মুহাব্বত, ভীতি, আশা-ভরসা, তাওবা এবং বিনয় ইত্যাদি।

আল কোরআনে ইবাদত ঃ

১ সূরা : যারিয়াত ৫৬-৫৮

২ সূরা : বাক্বারা ২১

আল-কোরআনে ইবাদত দুইটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(১) العبودية العامة সাধারণ দাসত্ব: অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ও বড়ত্বের দাসত্ব। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾ مريم: ٩٣

'নভোমন্ডলে এবং ভূমন্ডলে এমন কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।'[১]

এ আয়াতের আলোকে সৃষ্টিজগতের নেককার, পাপী, মুমিন, কাফের সকলেই আল্লাহর দাস। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ দাসত্ব করে। তবে এর মধ্যে বেশীর ভাগ হবে মুশরিক। যেমন আল্লাহ বলেন,-—

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ يوسف:١٠٦

'অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।'[২]

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يوسف: ١٠٣

'তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ মানুষই ঈমান স্থাপনকারী নয়।[৩]

(২) العبودية الخاصة বিশেষ ইবাদত বা ইচ্ছাধীন ইবাদত : ইখতিয়ার বা ইচ্ছাধীন,আনুগত্য এবং মুহাব্বত । যে ইবাদত মানুষ নিজের ইচ্ছায় সম্পাদন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ الفرقان:٦٣

'রাহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে 'সালাম'।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

১ সূরা : মারইয়াম ৯৩

২ সূরা : ইউসুফ ১০৬

৩ সূরা : ইউসুফ ১০৩

৪ সূরা : আল ফুরকান- ৬৩

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١٨﴾ الزمر : ١٧-١٨

'অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অত:পর যা উত্তম তার অনুসরণ করে।'[১]

এ প্রকার বন্দেগীতে মুমিনগণ অন্তর্ভুক্ত। কোন কাফির এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাধারণ ইবাদত এবং বিশেষ ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিম্নরূপ:

(১) সাধারণ ইবাদত (ইবাদতে আম্মাহ) এর মাঝে সকল সৃষ্টিজগত অর্ন্তভূক্ত। আর বিশেষ ইবাদত (ইবাদতে খাচ্ছাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানদারগণ অর্ন্তভূক্ত হবে। অতএব মুমিনরা কাফিরদের সাথে সাধারণ বন্দেগীতেও অর্ন্তভূক্ত। ইবাদতে খাচ্ছাহ এর মাঝে মুমিনরা কাফির থেকে পৃথক।

(২) সাধারণ ইবাদতে সকলেই অর্ন্তভূক্ত। কেউই তার বাহিরে নয়। আর ইবাদতে খাচ্ছাহ ইচ্ছাধীন, স্বাধীন।

(৩) কিয়ামতে শাস্তি এবং পুরষ্কার হবে ইবাদতে খাচ্ছাহর উপর। কারণ ইবাদতের মধ্যে এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এ জন্য আমরা দেখি সাধারণ ইবাদত (উবুদিয়্যাতে আম্মাহ) কাউকে ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারে না। আবার কাউকে কুফুর থেকেও বাহির করতে পারে না।

ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে আনুগত্য :

অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে আসল হচ্ছে আনুগত্য। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নতে যে বিষয় প্রমাণিত নয় তা ইবাদত হিসাবে মনে করা কোন মাখলূকের জন্য বৈধ নয়। প্রমাণ: নবী (সা:) বলেন: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح البخاري:٢٤٩٩ 'যে ব্যক্তি কোন কাজ করল অথচ ঐ কাজে আমার কোন অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখাত।'[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে নবী কারীম সা. বলেন: যে ব্যক্তি আমার শরীয়তে কোন নতুন আবিষ্কার করল, যা শরীয়ত সমর্থন করে না, তা প্রত্যাখ্যাত।

এজন্য আমরা দেখতে পাই এক দল সাহাবীদের কাজকে রাসূল সা. প্রত্যাখ্যান করেছেন । যারা রাসূল সা. এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর নিজেদের

---

১ সূরা : যুমার: ১৭-১৮

[2] বুখারি: ২৪৯৯

ইবাদতকে খুবই কম মনে করল। আর বলল, যার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ তিনি এতো ইবাদত করেন? একজন বলে উঠল, আমি আজীবন পুরো রাত নামাজ পড়ব। অপর জন বলল, আমি সারা বছর রোজা পালন করব, কখনো রোজা ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি বিবাহ করবো না। চিরকুমার থাকব। অত:পর নবীজী আসলেন এবং বললেন, তোমরা এ ধরণের কথা বলছিলে? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহকে ভয় করি। অথচ রোজা রাখি, রোজা ত্যাগ করি, নামাজ আদায় করি, নিদ্রা যাই, বিবাহ করি। (এসবই আমার আদর্শ) অতএব যে আমার আদর্শের বিপরিত করে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

এতে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা কতবড় বিপদের মধ্যে আছে, যারা ঐ সকল ইবাদতে জড়িত যা নবী সা. করেন নাই। যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে এবং নবী সা. এর অনুসরণ করে। যদিও তারা মনে করে থাকে তাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। মূলত: আল্লাহর কাছে এ ধরণের ইবাদতের কোন মূল্য নেই। বরং নবী সা. এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে এটা তাদের জন্য শাস্তির কারণ হবে।

ব্যাপক অর্থে ইবাদত

মানব সৃষ্টির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। এটা ঠিক নয় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, বছরের নির্দিষ্ট দিনে রোজা পালন, জান-মাল পবিত্র করার জন্য সম্পদের সামান্য জাকাত প্রদান, সারা জীবনে একবার হজ্ব পালনের মধ্যে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ। এগুলো অবশ্যই বড় ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এ কথা সত্য, উল্লেখিত ইবাদতগুলো পালনে একজন মানুষের জীবনের খুব কম সময়ই ব্যয় হয়। কোন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ কি এটা মেনে নিবে? যে, সে তার জীবনের বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদত ছাড়াই অতিবাহিত করবে ? অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তাকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

অনেক মানুষ এমন আছেন যারা ইবাদতকে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কতিপয় কাজ মনে করে, শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের বিষয় বলে ধারণা করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এমন দাবী যারা পোষন করেন কুরআনুল কারীম তাদের এ দৃষ্টিভংগিকে বাতিল দাবী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ النحل:٨٩﴾

'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি, যেটি এমন যে, তাতে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।'[১]

এমনিভাবে আল্লাহর নবীর জন্য যে দিকনির্দেশনা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তাতে ইবাদতে ব্যাপকতাকে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ الأنعام

'আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তার কোন শরীক, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমি হলাম প্রথম।'[২]

ইসলামের ইমাম ও বিদ্বানগন যুগে যুগে ইসলামী শরয়ীয়তে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাতেও প্রমাণ হয় যে ইবাদত সীমিত গন্ডির কোন বিষয় অথবা আনুষ্ঠানিক বস্তু নয়। প্রখ্যাত সাহাবী আবু জর আল গিফারী রা. এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রাসূল সকল বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখীর দুটি ডানা কিভাবে নড়াচড়া করে তার গুঢ় রহস্য কি, তাও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

জীবনের বাকে বাকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় ওলামায়ে কেরাম ইসলামী শরীয়তের দিক নির্দেশনা দিয়েও প্রমাণ করেছেন যে ইবাদত সীমিত গন্ডির মধ্যে অথবা আনুষ্ঠানিক বস্তু নয়।

ইবাদতের ব্যাপকতা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বিস্তৃতি ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিও তা জানেন। এমনকি এ সম্পর্কে অমুসলিম লোকও সাক্ষী দিয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সালমান ফারসী রা. কে বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের নবী সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন। এমনকি কিভাবে পেশাব, পায়খানা করবে তাও। সালমান রা. জবাব দিলেন, হ্যাঁ, নবী সা. আমাদের নিষেধ করেছেন.কেবলামুখী হয়ে পেশাব– পায়খানা করতে, তিনটি হতে কম ঢিলা ব্যবহার করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে, হাড্ডি অথবা শুকনা গোবর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে।[৩]

১ সূরা : নাহল-৮৯

২ সূরা : আনআম- ১৬২-১৬৩

৩

ইবাদতের মৌলিক ভিত্তিসমূহ:

ইবাদতের তিনটি রুকন বা ভিত্তি আছে। যা ছাড়া ইবাদত সঠিক হয় না।

(১) পূর্ণাঙ্গ আল্লাহর মহব্বত:

আল্লাহর মুহাব্বত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। যে ভিত্তির উপর ইসলাম ধর্মে ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো আল্লাহর মুহাব্বত। পাখীর সাথে তার মাথার যে সম্পর্ক, ইবাদতের সাথে আল্লাহর মুহব্বতের সে রকমই সম্পর্ক। অতএব যে পাখীর মাথা নেই সেই পাখীর প্রাণ নেই। যে ইবাদতে আল্লাহর মুহাব্বত নেই সেই ইবাদতের অস্তিত্ব নেই।

মুহাব্বত দ্বারা বিদআাতীদের মিথ্যা মুহাব্বত, দার্শনিকদের কাল্পনিক মুহাব্বত অথবা সূফীদের মুহাব্বতের দাবী উদ্দেশ্য নয়। বরং যে মুহাব্বতে বিনয়ী এবং আল্ল-াহর মহত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায় তা হল সত্যিকার মুহাব্বত। বান্দা তার প্রেমাষ্পদের জন্য উৎসর্গ হতে সদা প্রস্তুত থাকবে। যা আল্লাহর পছন্দ তা তারও পছন্দ। যা আল্লার অপছন্দ তা তারও অপছন্দ। আল্লাহর আদেশসমূহ সে বাস্তবায়ন করে এবং নিষেধগুলো বর্জন করে। আল্লাহর প্রিয়জনকে বন্ধু বলে মনে করে। আর শত্রুকে শত্রু বলে মনে করে। আর কোন বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির করণ তা জানার একমাত্র পথ হলো রাসূলের পথ অনুসরণ করা। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ (ال عمران: ٣١)

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন।'[১]

মুখে ভালোবাসার দাবি, অন্তরে তীব্র পিপাসা আচে, কিন্তু কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে রাসূলে যা এসেছে, তার অনুসরণ থেকে দূরে থাকলে কিয়ামত দিবসে ঐ ভালোবাসা তার কোন উপকারে আসবে না। এটা হবে ভালবাসার নামে আল্লাহর সাথে মিথ্যা এবং প্রতারণা মাত্র।

আল্লামা ইবনুল কাসীর রহ. বলেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালাকারী যে দাবী করে আল্লাহর মুহাব্বতের, অথচ সে মুহাম্মাদ সা. এর সুন্নাহ অনুসরণ করে না। তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। যতক্ষণ না সে শরীয়তে মুহাম্মদীর এবং নবী সা. এর অনুসরণে সকল কথা ও কাজ না করবে। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়ত অনুমোদিত নয়

---

১ সূরা : ইমরান: ৩১

এমন কাজ করল, তা প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ এর দ্বারা তোমরা যা চাও, তার চেয়ে বড়টা তোমাদের অর্জন হবে। তা হলো তোমরা আল্লাহকে নয়, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। হাসান বসরী রহ. বলেন, কতিপয় লোক দাবী করে তারা আল্লাহকে ভালবাসে। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করেছেন। বলেছেন, যদি আল্লাহর ভালোবাসা চাও রাসূলকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

(২) আশা করা

মানুষ রাসুলের অনুসরণ করে আল্লাহর জন্য যে সব ইবাদত করবে, তাতে সে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করবে। আল্লাহ বিশাল দান ও অগণিত অনুগ্রহে সে আনন্দিত হবে। এ অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহের জন্যও সে আল্লাহর রহমত কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ البقرة:٢١٨﴾

'এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুনাময়।'[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآَتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ العنكبوت:٥﴾

'যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'[২]

যখন বান্দা কোন গুনাহ করে বসে পাপাচারে সীমা লঙ্ঘণ করে, তাকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবে না এবং আল্লাহর ক্ষমা হতে হতাশ হতে পারে না। বরং তাকে দ্রুত তাওবা করতে হবে, গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট মুক্তির আশায়। আল্লাহ বলেন-

১ সূরা : আলা বাক্বারা : ২১৮

২ আনক্বাবুত : ৫

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الزمر: ٥٣﴿

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء (سنن الدارمى: ٢٦١٥)

'আমি আমার বান্দার ধারণামত হয়ে থাকি। অতএব সে আমাকে যেমন চায় ধারণা করুক।'[২]

বান্দার জন্য উচিত আল্লাহর রহমত, সাওয়াব এবং ক্ষমা কামনার সাথে সাথে শরীয়ত মত আমল করা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকে বাস্তবে রূপ দানে সাধনা করা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾الكهف:١١٠﴿

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'[৩]

কারণ আমল ছাড়া বড় বড় আশা করা ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়।

আশা তিন প্রকার

তন্মধ্যে দুইটি প্রশংসনীয়। অপরটি নিন্দনীয়। প্রথমটি হল : আল্লাহর দিক নির্দেশনা মত আল্লাহর আনুগত্যকারী ব্যক্তির আশা। আল্লাহর ক্ষমা, অনুগ্রহ, দয়া, মর্যাদার আশাবাদী হওয়া।

দ্বিতীয়টি হল: কোন গুনাহের পর তাওবাকারী ব্যক্তির আশা। সেও আল্লাহর ক্ষমা ,অনুগ্রহ, দয়া, মর্যাদার আশাবাদী হবে। এই দুইটি আশা প্রশংসনীয়।

১ আল যুমার : ৫৩

2 দারেমি:২৬১৫

৩ সূরা কাহফ : ১১০

তৃতীয়টি হল : গুনাহ পাপাচারে ডুবে থাকা ব্যক্তির আশা। সে আশা করে আমি যা করছি আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন। সে কোন কাজ ব্যতীত আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। এটা আল্লাহর সাথে প্রতারণার শামিল এবং অবাস্তব বাসনা মাত্র। এ প্রকারের আশা নিন্দনীয়।

তৃতীয়ত: আল্লাহর ভয়

আল্লাহকে ভয় করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ﴿ ال عمران:١٧٥﴾

'নিশ্চয়ই এরাই সে শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদের থেকে তোমাদের ভয় দেখায়। কিন্তু যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তবে তাদের ভয় করো না আমাকেই ভয় কর।'[১]

আল্লাহর বাণী : إِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿البقرة:٤٠﴾.

'আমাকেই ভয় কর।'[২]

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ المؤمنون

'নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করেনা। এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে যে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।'[৩]

আম্মাজান আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার বর্ণনা

---

১ সূরা ইমরান : ১৭৫
২ সূরা : বাক্বারাহ : ৪০
৩ সূরা : মুমিনুন : ৫৭-৬১

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. . . .

'এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে ... এ আয়াত কি যে ব্যভিচার, মদ্যপান এবং ও চুরি করে তার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে? নবী সা. বললেন, হে সিদ্দীকের কন্যা! না ঐ ব্যক্তির জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং ঐ ব্যক্তির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে রোজা পালন করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর এই ভয়ে থাকে যে, যদি আমার এ আমলসমূহ কবুল না হয়। হাসান বসরী রহ. এ সম্পর্কে বলেন: তারা আনুগত্য এবং বিনয়ের সাথেই আল্লাহর ইবাদত করেছে, তার পর ও তাদের মাঝে ভীতি কাজ করে যে, কবুল না হলে তো শাস্তি পেতে হবে।

মুমিনদের মধ্যে বিরাজ করে কল্যাণ এবং ভীতি। আর মুনাফিকদের মধ্যে বিরাজ করে খারাবী এবং বাসনা।

ইসলামী শরীয়ত বান্দার নিকট ঐ ভীতি কামনা করে যা তার মধ্যে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ লঙ্ঘন করার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ এ সীমা ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহর রহমত হতে নৈরাশ্য এবং হতাশা জন্ম নিতে পারে। আর আল্লাহ থেকে নিরাশ বা হতাশ হওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কারণ এতে আল্লাহর উপর খারাপ ধারণা জন্ম হয়।

আশা এবং ভীতির মাঝামাঝি অবস্থান

বান্দার জন্য অবশ্যই করনীয় হচ্ছে আশা এবং ভীতির মধ্যে অবস্থান করা। শুধু আশাহীন ভীতির মধ্যে থাকাই নিরাশা এবং হতাশা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. ﴿يوسف:٨٧﴾

'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত হতে কাফের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ হতাশ হয় না।'[১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:—

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. ﴿الحجر:٥٦﴾

'পালনকর্তার রহমত হতে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?'[2]

---

১ সূরা : ইউসুফ : ৮৭

2 হিজর : ৫৬

আল্লাহ ভীতি ছাড়া শুধু তার রহমতের আশা হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা যা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾[الأعراف:٩٩]

'আল্লাহ তাআলার পাকড়াও হতে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।'[১]

এ জাতীয় বিশুদ্ধ অনেক বর্ণনা এসেছে যাতে বান্দাদের আশা এবং আল্লাহ-ভীতি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার জন্য আহবান করা হয়েছে। এবং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করে চলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾[الإسراء:٥٧]

'তারা যাদেরকে আহবান করে তারাইতো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে এবং তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।'[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾[الزمر:٩]

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের ভয় রাখে এবং তার পালন কর্তার রহমত প্রত্যাশা করে।'[৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا .﴾[السجدة:١٦]

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও আশায়। ভয়ে।'[৪]

বান্দা যখন আশা এবং ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করবে, তখন তার উচিত তার মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা। যখন আল্লাহ তাআলার ভয় প্রবল হয়ে উঠে এবং তার রহমত হতে নিরাশ হয়। যেমন রোগ হলে এবং গোনাহ করলে তখন

১ সূরা : আরাফ: ৯৯

২ সূরা : বনি ইসরাইল: ৫৭

৩ সূরা : যুমার-৯

৪ সূরা : সেজদাহ-১৬

তার কাজ হলো উভয়ের মাঝে তুলনা করা এবং ভয়ের প্রবলতা কমানো। আর যখন আশার দিকটা প্রবল হয়ে উঠে এবং আল্লাহ তাআলার পাকড়াওকে পরোয়া করে না। যেমন, সুস্থতা, এবং ইবাদত বন্দেগী করার পর তখনো সে উভয়ের মাঝে তুলনা করবে এবং আশার প্রবলতা কাটিয়ে উঠবে। যদি আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হওয়ার অথবা আল্লাহর পাকড়াও থেকে উদাসীন হবার ভয় না হয়, তবেই উভয়ের মাঝে তার সমতা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

এই তিনটি রুকুনের মান নির্ণয় হয় মানুষের আত্মা থেকে:

মানষের হৃদয় আল্লাহ তাআলার প্রকৃতিতে পাখীর মত। মুহাব্বত তার মাথা, আশা এবং ভয় তার দুইটি ডানা, যখন মাথা এবং ডানাদুটি ভালো থাকবে, পাখীর উড্ডয়নও ভালো থাকবে। মাথা কেটে ফেলা হলে পাখীর মৃত্যু ঘটবে। আর দুটি ডানা নষ্ট হলে পাখিটি শিকারীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। বান্দার উচিত এই তিনটি রুকুন সম্মিলিতভাবে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানো। একটা বা দুইটার প্রতিফলন বাকিটা বর্জন বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলার এক প্রিয় বান্দা বলেছেন: ‘যে শূধু মাত্র আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতেই বন্দেগী করে সে হলো জিন্দিক বা নাস্তিক; যে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার আশার মধ্যে বন্দেগী করে সে হলো মুরজী, যে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার ভীতির মধ্যে বন্দেগী করে সে হলো হারুরী; যে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে মুহাব্বত, আশা এবং ভীতির মধ্যে থেকে, সে হলো একত্ববাদে বিশ্বাসী ঈমানদার। আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া মুহাব্বত সামান্য কিছু পাপ থেকে বাঁচাতে পারে। আশাহীন বন্দেগী মিথ্যা দাবি মাত্র। এই জন্য যারা ভয় পোষণ করে না, শুধু মুহাব্বতের দাবী করে তারা বেপরোয়া গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। যেমন ইয়াহুদী সম্প্রদায়। তারা বলে:

نحن أبناء الله و أحبائه

‘আমরাই আল্লাহ তাআলার প্রিয় সন্তান। তার প্রিয় জন।’ অথচ পাপাচার কাজে সারা পৃথিবীর শীর্ষে তারা। এজন্য আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবী সা. কে বললেন: তাদের বলতে,

فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ (المائدة: ١٨)

‘তাহলে তোমাদের পাপাচারের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন কেন ?[১]

১ সূরা : মায়েদা - ১৮

এমনিভাবে শুধু মাত্র আশা করার মধ্যে শিথিলতার জন্ম দেয়। এক পর্যায়ে সে আল্লাহ তাআলার কৌশলকে আল্লাহর পক্ষে তার জন্য আশ্রয় মনে করে এবং পাপাচার ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়।

এমনিভাবে শুধু মাত্র ভীতি বান্দাকে নিরাশ এবং হতাশার দিকে নিয়ে যায়, এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভুল ধারণা জন্ম দেয়। অতএব বান্দা তার ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল কাজে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত, আশা, ভীতির সম্মিলন ঘটাবে এবং এটাই তাওহীদ, এটাই ঈমান।

ইবাদত কবুলের শর্তসমূহ

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এশর্তগুলো ছাড়া ইবাদতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যদি দুইটি অনুপস্থিত থাকে তবে ইবাদত শুদ্ধ হয় না।

এশর্ত গুলো নিম্নরূপ:

১. الصدق في العزيمة : সংকল্পে সততা। সততা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য বান্দা আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নের এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে তার শক্তি-সামর্থ কাজে লাগাবে। আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয়া। আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অলসতা, দূর্বলতা ছেড়ে দেয়া। দৃঢ়ভাবে পরহেজগারীর লাগাম টেনে ধরতে হবে, যাতে হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ البقرة: ١٧٧﴾

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলার উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেস্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং

যারা কৃত ওয়াদা রক্ষা করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকরে, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই হলো মুত্তাকী।[১]

আর আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদের কথা এবং কাজে অমিলের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ الصف

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন ? তোমরা যা করনা তা বলা আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই অসন্তোষজনক।'[২]

সততা হলো ঈমানের মূল। ঈমানদাররা নিয়্যত, কাজ ও কথায় সত্যাবাদী হয়। যেমন মিথ্যা হলো নিফাকের মূল; মুনাফিকরা নিয়্যত, কাজ এবং কথায় মিথ্যাবাদী হয় । আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদের সততার জন্য পুরস্কৃত করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴿الأحزاب:٢٤﴾

'এটা এই জন্যে যাতে আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার কারণে প্রতিদান দেন।'[৩]

মুনাফিকদের এ বলে ধমকি দেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে রেখে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء: ١٤٥)

'নি:সন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।[৪]

২. আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাস ঃ ইখলাস বা আন্তরিকতা বিষয় কোরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ البينة:٥﴾

'তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে।'[৫]

---

১ সূরা : আল বাক্বারা-১৭৭
২ সূরা : আল আহযাব :২৪
৩ সূরা : আল আহযাব-২৪
৪ সূরা : আল নিসা-১৪৫
৫ সূরা : বাইয়িনাত : ৫

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে, এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'[১]

আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ (الزمر: ١٤-١٥)

'বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি। অতএব তোমরা তাঁর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর।'[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴿٣﴾ الزمر

'আমি আপনার নিকট এই কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ তাআলারই নিমিত্তে।'[৩]

ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন,

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (صحيح البخاري:١)

'নি:সন্দেহে যাবতীয় আমলের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেককে জন্য তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। যার হিজরত আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, সে হিজরত আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি হিসেবেই গণ্য হয়। যার হিজরত দুনিয়া অর্জন অথবা কোন মহিলা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, সে যার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সে হিসেবেই গণ্য হবে।[৪]

---

১ সূরা : কাহফ : ১১০

২ সূরা : যুমার:১৪-১৫

৩ সূরা : যুমার :২-৩

৪ বুখারী : ১

আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন,

إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. (صحيح مسلم: ٤٦٥١)

'আল্লাহ তাআলা কারো আকৃতি অথবা সম্পদের দিকে তাকান না। তবে তার কাজ এবং অন্তরের দিকে তাকান।'[১]

আবু মুসা আল আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত—

سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذالك في سبيل الله فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. (صحيح البخاري: ٦٩٠٤)

তিনি বলেন রাসূল সা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঐ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে যারা লড়াই করে বীরত্ব প্রকাশের জন্য, লড়াই করে অহমিকা প্রদর্শনের জন্য, লড়াই করে.লোক দেখানো ভাবনা নিয়ে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ তাআলা জন্য লড়াই করল ? রাসূল সা. বললেন, যে লড়াই করে আল্লাহ তাআলার কালেমা (বানী) উচু করার জন্য সেই আল্লাহ তাআলার পথে লড়াই করে।[২]

প্রকৃত একনিষ্ঠতা হচ্ছে বান্দার বাসনা হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পরকালে শান্তি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ الليل

'এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, বরং শুধু তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়।'[৩]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ الإسراء

'যে কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করে, আমি তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেই, তারা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত

১ বুখারী : ৪৬৫১

২ বুখারী : ৬৯০৪

৩ সূরা : আল লাইল : ১৯-২০

অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা ঈমান নিয়ে পরকাল কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।[১]

আমল বিশুদ্ধ হবার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার মনের রোগ হতে অন্তরকে পরিষ্কার করা। যেমন অহংকার, ধোকা, গীবত ইত্যাদি। এমনিভাবে মানুষের মন্তব্য পর্যবেক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার থেকেও নিজেকে পরিস্কার করা। মানুষের প্রশংসা অর্জন, অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের খেদমত বা ভালবাসা অর্জন করার উদ্দেশ্য পরিহার করতে হবে। কারণ এই সবই হচ্ছে মাখলুকের নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া। যা অবশ্যই শিরক। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري

فهو للذي أشرك به وأنا منه بريئ. (ابن ماجة: ٤١٩٢)

'আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করল, এবং তাতে আমার সাথে কাউকে শরীক করল, তা হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যার সাথে সে শরীক করল। আর আমি এ মুশরিক থেকে দায়মুক্ত।[২]

ইবাদত: যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, ত্বাওয়াফ, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। এগুলো কবুল হওয়া এবং বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত। আর যদি আদত বা অভ্যাসগত হয়, যেমন পানাহার, নিদ্রা, উপার্জনকরা ইত্যাদি। তাহলে সাওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত।

৩. শরীয়ত সম্মত হওয়া ঃ আমল কবুল হওয়ার জন্য রাসূল সা. এর অনুকরণ অনুসরণ প্রয়োজন। অতএব বান্দা ইবাদত করবে, রাসূল সা. ইসলামে যে আদেশ নিষেধ নিয়ে এসেছেন তারই আলোকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ أل عمران: ٨٥﴾

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম খোজ করে, কষ্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালেও সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।'[৩]

রাসূল সা. বলেছেন, যে লোক আমাদের শরীয়তে নতুন কিছু অন্তর্ভূক্ত করল, তা প্রত্যাখাত। অতএব এই তিনটি শর্ত ছাড়া ইবাদতের কোন কাঠামো দাড়

১ সূরা : বনী ইসরাইল : ১৮-১৯

২ ইবনে মাজাহ : ৪১৯২

৩ সূরা : আল ইমরান : ৮৫

করানো সম্ভব নয়। নিয়্যত বা সংকল্পে সত্যাবাদী হওয়া ইবাদতের অস্তিত্বের জন্য শর্ত। আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাস এবং সুন্নাতের মোতাবেক হওয়া ইবাদত শুদ্ধ এবং কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। অতএব কবুল ইবাদতের উপস্থিতি আশা করা যাবে, যদি ঐ তিনটি শর্ত একত্রে পাওয়া যায়। নিয়্যত একনিষ্ঠতা বা ইখলাস, সংকল্পে সত্যতা ছাড়া, ইবাদত কবুলের আশা করা নির্বুদ্ধিতা এবং বাসনা ছাড়া ছাড়া আর কিছু নয়। সংকল্পে সত্যতা, নিয়্যতের বিশুদ্ধতা ছাড়া ইখলাসের তারতম্যে ইবাদত ছোট অথবা বড় শিরকে পরিণত হয়ে যায়। ইবাদতের উদ্দেশ্য যদি গায়রুল্লাহ হয়, তাহলে তা হবে মোনাফেকী। ইবাদতের শেষে যদি রিয়া বা লোকদেখানো ভাবনা চলে আসে, আর তার শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেও ইবাদত প্রকারভেদে ছোট শিরক হয়ে যায়। নিয়্যতের বিশুদ্ধতা, সংকল্পে সত্যতা থাকারও পরও যদি আমল সুন্নত মোতাবিক না হয়, তা হলে তা হবে বিদআত এবং শরীয়তে নবআবিস্কৃত-কুসংস্কার। যা ইসলামে নি:সন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সকলকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। কোন কাজ প্রকাশ পায় না দৃঢ় সংকল্প ছাড়া, আবার ইখলাস এবং সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ছাড়া কাজটা কবুলও হয় না। এজন্য

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي: ليبلوكم أيكم أحسن عملا: هوأخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذاكان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، ثم قرأ قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الكهف:١١٠﴾

ফুদাইল বিন আয়াজ আল্লাহর বাণী ليبلوكم أيكم أحسن عملا অর্থঃ 'যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের কর্মে শ্রেষ্ঠ।' (আল- মুলক: ২) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ هوأخلصه وأصوبه : তা একনিষ্ঠ ও সঠিক। তাকে প্রশ্ন করা হল এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বললেন: আমলে ইখলাছ আছে কিন্তু সঠিক ভাবে আদায় হয় নাই তাহলে কবুল হবে না। আবার সঠিক ভাবে আদায় হচ্ছে কিন্তু এখলাছ নাই। তাহলেও কবুল হবে না। কবুল হওয়ার জন্য দুইটি বস্তু প্রয়োজন ইখলাছ ও বিশুদ্ধতা, ইখলাছ মানে হচ্ছে ইবাদত হবে আল্লাহর জন্য। আর

বিশুদ্ধতা মানে হচ্ছে ইবাদত হবে রাসুল সা. এর সুন্নাত অনুযায়ী। অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করেন। যার অর্থঃ 'যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন বিশুদ্ধ আমল করে এবং তার প্রভুর এবাদতে কাউকে শরিক না করে।' সূরা : ক্বাহাফ: ১১০

এবাদতের প্রকার

উপরে উলেখিত বর্ণনা মতে এবাদত মানব জীবনের সকল দিককে আওতাভূক্ত করে। এবাদত পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হয়:

(১) আত্মিক এবাদত :

এই এবাদত অন্য সকল ইবাদতের মূল, এতে ত্রুটি দেখা দিলে শিরকে আকবর অথবা শিরকে আছগরে প্রবেশের সম্ভাবনা বেশী থাকে। আত্মিক এবাদত এ জন্য বলা হয়, কারণ এটা আত্মার স্বীকৃত ও তার কাজ। আত্মিক এবাদতের মধ্যে বড় এবং মূল ইবাদত হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলাই এই জগতের প্রতিপালক। রাজত্ব তার জন্য, সৃষ্টি তার জন্য, কর্তৃত্ব তার জন্য, এবং এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুনাবলী রয়েছে। যে গুনাবলী সৌন্দর্য্যের, পরিপূর্ণতার, কর্তৃত্বের। এবং এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ একজন। তার কোন অংশীদার নাই। তিনিই উপাসনার যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাসনা পাবার যোগ্য নয়।

আত্মিক ইবাদতের মধ্যে রয়েছে ইখলাছ, মুহাব্বত, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল (ভরসা) ইত্যাদি।

কোন আত্মিক ইবাদতই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উৎসর্গ বৈধ নয়। সেটা প্রেরিত নবী, সম্মানিত ফেরেস্তা, আল্লাহর অলী, পাথর, গাছ, সূর্য্য, চন্দ্র, নেতা, কোন সংবিধান, দল, বা অন্য যে কোন কিছুর জন্য হোকনা কেন।

মৌখিক এবাদত:

মৌখিক ইবাদত এ জন্য বলা হয় কারণ তা মূখের কথা ও শব্দ দ্বারা আদায় হয়ে থাকে। এই মৌখিক ইবাদতের মধ্যে বড় ইবাদত হচ্ছে তাওহিদী কালেমার উচ্চারণ। যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে অথচ কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও তাওহিদী কালেমা উচ্চারণ করে না, সে মুসলমান বলে গণ্য হবে না এবং মৌখিক স্বীকৃতীবিহীন ইসলাম তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে না। যেমন রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন—

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوا ها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.

(صحيح البخاري: ٢٤)

'আমি অদৃষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা ইলাহা ইলালাহু' যদি তারা লাইলাহা ইলালাহু বলে এবং নামায পড়ে আমাদের কেবলাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে। আমাদের পদ্ধতিতে পশু জবেহ করে, তাহলে তার প্রাণ ও সম্পদ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায় এই কালেমার স্বার্থে। অবশ্য তাদের (অন্তরের সত্যাসত্যের) ফায়সালা আল্লাহর হাতে।[১]

যারা এই কালেমা উচ্চারণ করলো তবে অন্তরে বিশ্বাস করলনা, যেমন মুনাফিক। এ কালেমার উচ্চারণ তার প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে। কিন্তু তার চুরান্ত ফয়সালা আল্লাহর হাতে। মৌখিক ইবাদতের মধ্যে আরো আছে যিকির, দোয়া, আউজুবিল্লাহ বলা, বিসমিল্লাহ বলা, ইস্তেগফার করা ইত্যাদি।

শারিরিক ইবাদত :

এ সকল ইবাদতকে শারীরিক ইবাদত এ জন্য বলে যে, ইবাদতগুলো শরীরের মাধ্যমে আদায় হয়, শারীরিক এবাদতের মধ্যে রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায, রোযা, তাওয়াফ, স্বশরীরে আল্লাহর পথে জিহাদ।

আর্থিক ইবাদত:

এটা হল ঐ সকল ইবাদত যা শুধু সম্পদের মাধ্যমে আদায় হয়। যেমন যাকাত, ফিৎরা, আল্লাহর পথে দান ইত্যাদি।

আর্থিক ও শারিরিক ইবাদত:

যে সকল ইবাদত দৈহিক শ্রম ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন হজ্ব, ওমরাহ পালন, জিহাদ ইত্যাদি।

১ বুখারী : ২৪

আল-কোরআনুল কারীম
মর্যাদা, শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা

মানব অন্তর কালিমাযুক্ত হয়ে কঠিন হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রাচুর্যের মোহ ও প্রবৃত্তির চাহিদা নফ্‌সকে দুর্বল ও অসাড় করে ফেলে। মানুষকে এ পৃথিবীতে নফ্‌স, প্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। একজন যোদ্ধাকে যদি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার অস্ত্রের মুখাপেক্ষী হতে হয় তাহলে চিরন্তন সফলতা যে যুদ্ধে বিজয় লাভের উপর নির্ভরশীল এমন যুদ্ধের যোদ্ধাকে অবশ্যই সক্রিয় ও কার্যকর অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। আর তা হচ্ছে স্বীয় নফ্‌সকে সংশোধন ও পবিত্রকরণ। এ ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য কোন পথ ও পদ্ধতি নেই। কোরআন সম্পর্কে বলতে গেলে রমজান প্রসঙ্গে দু'টি কথা বলতে হয় কয়েক কারণে। যেমন :—

১. রমজান মাসেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন অবতরণের সূচনা রমজান মাসেই হয়েছে, তখন সূরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়।

৩. জিবরাইল রমজানের প্রতি রাতে এসে রাসূলুল্লাহ সা.-কে কোরআন শিখাতেন আর তিনিও তাকে পূর্ণ কোরআন শুনিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারটি রমজান মাসে কোরআন খতমের বৈধতাকে প্রমাণ করে। তাছাড়া কোরআন খতম সারা বছরেই গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব। তবে, রমজানে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

প্রথমত : কোরআনের মর্যাদা, ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য

কোরআনুল কারীমের মর্যাদা, ফজিলত, অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যেমনি এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে। কতক এখানে তুলে ধরা হল।

(১) কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার কালাম। তিনি তা স্বীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রূহুল আমীন জিবরাইল এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. (التوبة :٦)

'মুশরিকদের কেউ যদি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আপনি তাকে আশ্রয় দিয়ে দিন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।'[১]

(২) কোরআন মানবতার জন্য দিক-নির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা। তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট পথ-পানে পথ-নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.(الإسراء:٩)

'নিশ্চয় এ কোরআন এমন পথ-প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।'[২]

কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদের যা যা প্রয়োজন হবে, সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এ কোরআনে, আল্লাহ বলেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾. (النحل:٨٩)

'এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।'[৩]

৩. মহান আল্লাহ তাআলা এর নাম দিয়েছেন ফোরকান (পার্থক্যকারী) যা হালাল-হারাম, হেদায়াত-গোমরাহি এবং হক ও বাতেলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে।

৪. কোরআনুল কারীম আমাদের পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী, পরবর্তীদের সংবাদ, মোমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং কফেরদের জন্য জাহান্নামের দু:সংবাদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বর্ণিত সকল বিষয়ের বর্ণনায় এটি ততোধিক সত্য বক্তব্য প্রদানকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا . (الأنعام : ١١٥)

---

[১] সূরা তাওবা : ৬

[২] সূরা ইসরা :৯

[৩] সূরা নাহল :৮৯

'আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম।'[১]

৫. আল কোরআন বিশ্ববাসী সকলের জন্য রহমত। সে গাফেল হৃদয়কে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, অন্তরকে শিরক-নিফাক এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ করে তোলে। যেমন এ কথা সূরা ফাতেহা ও সূরা নাস, ফালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. (يونس:٥٧)

'হে মানবকুল ! তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং যা মোমিনদের জন্য অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত।'[২]

তাই দেখা যায় কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্ত হয়। দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِّ أَلَا بِذِكْرِ اللهِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (الرعد:٢٨)

'যারা ঈমান আনে- বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।'[৩]

কোরআনুল কারীম খুবই বরকতময়। তার উপকারিতা সু-বিশাল, মানবকুল কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়া আখেরাত—উভয় জগতের কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করতে পারে, এরশাদ হচ্ছে :—

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ (طه-١٢٣-١٢٦)

'এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং

[১] সূরা আনআম : ১১৫
২ সূরা : ইউনুস : ৫৭
৩ সূরা : রায়াদ-২৭

আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালন-কর্তা ! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন ? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম ? আল্লাহ বলবেন—এমনি ভাবে তোমার কাছ আমার আয়াতসমূহ এসেছিল। অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনি করে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল।[১]

৭. আল-কোরআনুল কারীম এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিতাব যা আল্লাহ তাআলার সংরক্ষণে সংরক্ষিত। আল্লাহ বলেন :—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .(الحجر-٩)

'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।'[২]

৮. কোরআনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, যে ব্যক্তি এটি বুঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সে তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, হৃদয়ে নাড়া দেয়। অন্তরকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে। আত্মাকে করে সংশোধিত। মানুষকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। তার প্রভাব ও আছর শুধু মানবকুল পর্যন্তই সীমিত নয় ; বরং একে যদি খুব মজবুত ও শক্ত পাহাড়ে অবতীর্ণ করানো হত তাহলে অবশ্যই সেটি কেঁপে উঠত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ . (سورة الحشر:٢١)

'যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে আপনি দেখতে পেতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৩]

৯. আল-কোরআন এ উম্মতের জন্য উপদেশ ও সম্মানের বস্তু। এরশাদ হচ্ছে:—

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. (الزخرف : ٤٤)

'কোরআন তো আপনার ও আপনার জাতির জন্য সম্মানের বস্তু। অবশ্যই এ বিষয়ে সত্ত্বর জিজ্ঞাসিত হবেন।'[১]

---

১ সূরা : ত্বহা আয়াত : ১২৩-১২৬

২ সূরা : হিজর- ৯

৩ সূরা : হাশর : ২১

১০. সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল কোরআনের সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত সহীহ-শুদ্ধ হয় না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :—

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب–متفق عليه.

যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার সালাতই হয় না।[২]

(১১) যারা হেদায়াত প্রত্যাশা করে এবং এর জন্য চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে কোরআনের তেলাওয়াত, বুঝা, হিফয করা, এর বিষয়বস্তু গভীরভাবে চিন্তা করে হৃদয়ঙ্গম করা ও তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা খুব সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ (القمر:١٧)

'এবং আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য। কোন চিন্তাশীল উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?[৩]

সুতরাং, কোরআন আল্লাহ তাআলার একটি বিশাল নেয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ। তাই আমাদের সকলের এ কোরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়া এবং সদা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾: (يونس:٥٨)

বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তারা যা সঞ্চয় করছে তা অপেক্ষা এটিই অতি উত্তম।[৪]

দ্বিতীয়ত : কোরআনুল কারীমের মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান :—

পৃথিবীতে অনেক মুসলমান আছেন, যারা তার পক্ষে যতটুকু সহজ ততটুকু শুধুমাত্র তিলাওয়াতকেই কোরআনের যথাযথ হক আদায় ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তাদের সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী রহ. চমৎকার বলেছেন—

نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا.

---

১ সূরা : যুখরুফ : ৪৪

২ বোখারি ও মুসলিম

৩ সূরা : কমর : ১৭

৪ সূরা : ইউনুস : ৫৮

‘কোরআন—তদনুযায়ী—আমল করার জন্য অবতীর্ণ হল আর লোকেরা শুধু তেলাওয়াতকেই আমল বানিয়ে বসে আছে।’

সুতরাং, শুধু তেলাওয়াতই কোরআনের হক আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয় ; বরং যথার্থ মূল্যায়নের জন্য তেলাওয়াতের পাশাপাশি একে বুঝতে হবে—বুঝার চেষ্টা করতে হবে, হিফয করতে হবে, বর্ণিত বিষয়াদিতে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, তদনুযায়ী আমল করতে হবে। শাসন, বিচার ও বিরোধ-মীমাংসার জন্য তার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু, দু:খজনক ব্যাপার হল লোকেরা এর তেলাওয়াতকেই যথাযথ মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট মনে করছে। এর চেয়েও দু:খজনক হচ্ছে—যারা তেলাওয়াতকে যথেষ্ট মনে করছে তাদের অধিকাংশ এ তেলাওয়াতের ব্যাপারে অবহেলা-উপেক্ষা করছে :—

و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ পূর্ণ বৎসরে একবারও কোরআন খতম করতে পারে না। একটিমাত্র সূরাও মুখস্থ করে না। রমজান মাস, যখন সকল মুসলমান পূর্ণোদ্দমে কোরআন অধ্যয়নসহ সকল ইসলামি কর্মকাণ্ড সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করে, তখনও কিছু মুসলমানকে আপনি দেখতে পাবেন, যারা তেলাওয়াত থেকে দূরে, এ বরকতময় মাসেও এর খতম পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে না।

কোরআনুল কারীমের মূল্যায়নের দিকসমূহ :—

১. তেলাওয়াত করা :—

তেলাওয়াতের ফজিলত :—

(১) কোরআনুল কারীমের যথাযথ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন আল্লাহর সাথে একটি অতি লাভজনক ব্যবসা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ (فاطر : ٢٩)

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি

দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল মূল্যায়নকারী।[১]

(২) কোরআন তিলাওয়াতকারী প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

من قرأ حرفا من كتاب الله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لاأقول : (الـم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي

'যে ব্যক্তি কোরআন কারীম থেকে একটি অক্ষর তেলাওয়াত করবে তাকে একটি নেকি দেয়া হবে। এক নেকি হবে দশ নেকির সমতুল্য। আমি একথা বলি না যে الم একটি অক্ষর বরং الف একটি অক্ষর لام একটি অক্ষর ميم একটি অক্ষর। (الم তিলাওয়াত করলে ন্যূনতম ত্রিশটি নেকি প্রাপ্ত হবে)[২]

(৩) কোরআন তেলাওয়াতকারী ভিতর বাহির উভয় দিক থেকে উত্তম-উৎকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة: ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لايقرا القرآن كمثل التمرة: لا ريح لها، وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح، وطعمها مر. متفق عليه

'যে মোমিন কোরআন তেলাওয়াত করে সে জামীর সদৃশ যার সুগন্ধি বড় চমৎকার এবং স্বাদও সুমিষ্ট। আর যে মোমিন কোরআন তেলাওয়াত করে না সে খেজুর সমতুল্য। যার ঘ্রাণ নেই, কিন্তু স্বাদ বড় মিষ্ট। আর যে মুনাফেক কোরআন পাঠ করে সে রাইহান ফলের মত যার সুগন্ধি চমৎকার কিন্তু স্বাদ বড়ই তিক্ত। আর যে মুনাফেক কোরআন পড়ে না সে হানযালা বা কেদাঁ ফলের সমতুল্য যার কোন ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত।[৩]

৪. কোরআন পাঠে সাকীনা (বিশেষ রহমত) অবতীর্ণ হয়।

১ সূরা : ফাতির-২৯-৩০

২ তিরমিজি।

৩ বোখারি ও মুসলিম

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين (بحبلين)، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه

সাহাবি বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেছেন—জনৈক সাহাবি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। তার নিকট রশি দিয়ে বাঁধা একটি ঘোড়া ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং ক্রমেই সেটি কাছে আসছিল আর ঘোড়া ছোটাছুটি করছিল। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন সেটি সাকীনা (এক প্রকার বিশেষ রহমত যা দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়) কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

৫. কোরআনের একটি আয়াত (পাঠ করা বা শিক্ষা দেয়া) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :—

أفلا يغدو أحدكم إل المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم.

'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কোরআন হতে দু'টি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না ? তাহলে সেটি তার জন্য দু'টি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়ত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম।'[২]

৬. কোরআনুল কারীম নিয়মিত তেলাওয়াতকারী ও তদনুযায়ী আমলকারীর পক্ষে কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রাসূল সা. এরশাদ করেন—

إقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.

---

১ বোখারি ও মুসলিম

২ মুসলিম

তোমরা কোরআন.তেলাওয়াত কর, কেননা, কোরআন কেয়ামত দিবসে তেলাওয়াত ও আমলকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

يؤتى يوم القيمة يالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به فى الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما). رواه مسلم.

কেয়ামতের দিন কোরআন এবং পৃথিবীতে কোরআনের মর্মানুযায়ী আমলকারীদেরকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান আগে আগে চলবে এবং এদের তেলাওয়াত ও আমলকারীদের পক্ষে সুপারিশ করতে থাকবে।[২]

৭. কোরআনের পাঠক ও আমলকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.

'যে কোরআন শিখে ও শিক্ষা দেয় সে তোমাদের শ্রেষ্ঠতর।'[৩]

কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি সাহাবাদের আগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। তেলাওয়াতের মর্যাদা জানার পর তাদের কেউ কেউ সব সময়ের জন্য সারারাত না ঘুমিয়ে কোরআন তেলাওয়াতে কাটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. উক্ত সংকল্প সম্পর্কে জেনে এরূপ না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন বরং প্রতি সাত দিনে একবার করে খতম করতে পার। তাইতো দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই প্রতি সাত দিনে একবার করে খতম করতেন।

তেলাওয়াতের প্রতি তাদের এরূপ যত্নশীল হওয়া সত্ত্বেও যদি কখনো কেউ অন্য কাজে ব্যস্ততা হেতু বা ঘুমের কারণে রাতে পড়তে না পারতেন তাহলে পরদিন সে অংশটুকু অবশ্যই পড়ে নিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

---

১ মুসলিম

২ মুসলিম

৩ বোখারি

من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم

'যে ব্যক্তি স্বীয় নির্ধারিত অংশ বা তার অংশ বিশেষ রাতে না পড়েই ঘুমিয়ে যায় অত:পর পরদিন ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়। তাহলে রাতে পড়া হয়েছে ধরেই আল্লাহর নিকট নির্বাচিত হবে।'[১]

আবার তাদের কেউ কেউ প্রতি দিনে একবার করে খতম করতেন। রমজান মাস আসলে কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম আরো বেড়ে যেত। রমজানে সালাতে এবং অন্য সময় তেলাওয়াতের জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করতেন। ইমাম বোখারি রহ. বলতেন :—

إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام.

যখন রমজান আসবে তখন সেটি হবে একমাত্র কোরআন তেলাওয়াত ও অপরকে খাওয়ানোর মাস।

ইমাম মালেক রহ. রমজান আসলে হাদিসের অধ্যয়ন, ইলম শিক্ষার আসরসহ যাবতীয় কাজ ছেড়ে দিয়ে (রাতদিন শুধু) মাসহাফ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি বেশি মনোযোগী হতেন। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু চিন্তা ও গবেষণার দিক ও তেলাওয়াতের হক প্রদানকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু তেলাওয়াতের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হবে। বরং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় বা অক্ষর অস্পষ্ট থাকে এমন করে খুব দ্রুত বেগে তেলাওয়াত করার অনুমতি নেই। কালামুল্লাহ শরীফ তেলাওয়াতের অনেক আদব রয়েছে তেলাওয়াতকালে সে গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরি।

তেলাওয়াতের আদব ও আহকাম :

১. ইখলাস—সুতরাং লোকের প্রশংসা ও বাহবা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা যাবে না। এবং একে জীবিকা নির্বাহের উপলক্ষও বানানো যাবে না। বরং তেলাওয়াত কালে এ অনুভূতি ও আগ্রহ নিয়ে তেলাওয়াত করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাআলা তার মহান কালামের মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করছেন। একাগ্রতা ও চিন্তা গবেষণা বাদ দিয়ে শুধু সময় কাটানো এবং সুন্দর কণ্ঠের ক্বারীদের মিষ্টি

১ মুসলিম

আওয়াজ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা ও শোনা—কোনটিই জায়েজ নেই।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله عز وجل، من قبل أن يأتي قوم يتعجلون، ولايتأجلون.

رواه الإمام أحمد.

'তোমরা কোরআন পড় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর ; কারণ ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআনের দ্বারা দুনিয়ার সুখ অন্বেষণ করবে। পরকালের সুখ কামনা করবে না।'[১]

২. মিসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—মিসওয়াকের মাধ্যমে তোমার স্বীয় মুখ সুগন্ধি যুক্ত কর ; কেননা এটি কোরআনের রাস্তা।

৩. পবিত্রতা অর্জন করা : এটি আল্লাহ তাআলার কালামের মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন। অপবিত্রাবস্থায় গোসল না করে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। পানি না থাকলে বা অসুস্থতা ও এ জাতীয় কোন কারণে ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে। অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর জিকির এবং কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বাক্যাবলীর মাধ্যমে দোয়া করা জায়েজ। তবে ঐ বাক্যের মাধ্যমে তেলাওয়াত উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না, উদ্দেশ্য হবে শুধু দোয়া। যেমন—বলল :

لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

৪. তেলাওয়াতের জন্য অন্যায় অশ্লীল ও অনর্থক কথা-বার্তা এবং হৈ চৈ মুক্ত—পাশাপাশি কোরআনের ভাব মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ স্থান নির্বাচন করা। সুতরাং অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে এবং কোরআন শোনার প্রতি অমনোযোগী সমাবেশে তেলাওয়াত করবে না। কারণ এতে কোরআনের অমর্যাদা হয়। অনুরূপভাবে শৌচাগার ইত্যাদিতেও কোরআন পড়া জায়েজ নেই। তেলাওয়াতের জন্য সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহ—এতে একই সাথে তেলাওয়াত এবং মসজিদ অবস্থান উভয় সওয়াব পাওয়া যাবে। সাথে সাথে ফেরেশতাদের ইস্তিগফারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে—যখন নামাজের অপেক্ষায় থাকবে অথবা নামাজ আদায় করার পর বসবে।

১ মুসনাদে ইমাম আহমদ।

তেলাওয়াত ও জিকিরের উদ্দেশ্যে যারা মসজিদে বসে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন :—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. ﴿٣٧﴾ النور

আল্লাহ যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং সে গুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে।

(তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।[১]

৫. খুব আদবের সাথে বিনম্র ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে বসা। শিক্ষক সামনে থাকলে যেভাবে বসত ঠিক সেভাবে বসা। তবে দাঁড়িয়ে শুয়ে এবং বিছানাতেও পড়া জায়েজ আছে।

৬. আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার্থে আউযুবিল্লাহ ...বলা এবং এটি মোস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾. (النحل:٩٨)

যখন তুমি কোরআন পড়ার ইচ্ছা করবে তখন বল[২]—

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

(৭) সূরা তাওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার শুরুতে—

بسم الله الرحمن الرحيم

পড়া। যদি সূরার মাঝখান থেকে পড়া হয় তাহলে بسم الله الرحمن الرحيم পড়ার প্রয়োজন নেই।

---

১ সূরা : নূর-৩৬-৩৮

২ সূরা : আননাহাল-৯৮

(৮) উপস্থিত ও সচেতন মন দিয়ে তিলাওয়াত করা। চিন্তা করবে কি পড়ছে। অর্থ বুঝার চেষ্টা করবে। মন বিনম্র হবে এবং ধ্যান করবে যে মহান আল্লাহ তাকে সম্বোধন করছেন। কেননা, কোরআন আল্লাহরই কালাম।

(৯) তেলাওয়াতের সময় কান্নাকাটি করা। এটি নেককার সালেহীনদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ (الإسراء: ١٠٧-١٠٩)

যারা এর পূর্ব থেকে ইলম প্রাপ্ত হয়েছে—যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা নতমস্তক সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে : আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নি:সন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।[১]

এবং যখন ইবনে মাসঊদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন শোনাচ্ছিলেন, এবং পড়তে পড়তে —

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. (سورة النساء:٤١)

'তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী রূপে উপস্থিত করব।'[২]

—আয়াত পর্যন্ত পৌঁছোলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, حسبك (ব্যাস, যথেষ্ট) আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার নেত্র-দ্বয় অশ্রুসিক্ত। (বোখারি)

(১০) তারতীল তথা ধীরে-ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দর করে পড়া। এভাবে পড়া মোস্ত াহাব। কেননা আল্লাহ বলেন, । وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا অর্থাৎ কোরআন আবৃতি কর ধীরে ধীরে। স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।[৩] এভাবে পড়লে বুঝতে ও চিন্তা করতে সহজ হয়।

---

১ সূরা : ইসরা ১০৭-১০৯

২ সূরা : নিসা-৪১

3

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনই পড়তেন, তেলাওয়াত করতেন। উম্মুল মোমিনীন সালমা রা.-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনটিই বলেছেন যে প্রত্যেক শব্দ পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্ট ছিল। আবু দাউদ-মুসনাদের রেওয়াতে এসেছে :

وكان صلى الله عليه وسلم يقف على رأس كل آية .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন।'[১] সাহাবি ইবনে মাসউদ রা. বলেন :—

لاتنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.

তোমরা কোরআনকে গদ্য আবৃত্তির ন্যায় বিক্ষিপ্তাকারে আবার কবিতার ন্যায় পঙ্ক্তি মিলিয়ে তেলাওয়াত করবে না (বরং কোরআনের স্বতন্ত্র ধারা বজায় রেখে তেলাওয়াত করবে) বিস্ময়কর বর্ণনা আসলে থামবে এবং হৃদয় নাড়া দেয়ার চেষ্টা করবে। সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের কারো সংকল্প না হয়।[২]

তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে স্পষ্টকরে পঠিত অল্প তেলাওয়াত অনেক উত্তম, দ্রুততার সাথে পঠিত বেশি তেলাওয়াত থেকে।

কারণ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য তো বুঝা ও চিন্তা করা এবং এটিই ঈমান বৃদ্ধি করে। তবে হ্যাঁ, দ্রুততার সাথে পড়তে গিয়ে যদি শব্দের উচ্চারণ ঠিক থাকে তাড়া হুড়ার কারণে কোন রূপ বিভ্রাট-বিভ্রান্তি ও অক্ষরবিয়োগ বা অতিরিক্ত কিছুর সংযোগ—ইত্যাদি সমস্যা না হয় তাহলে অসুবিধা নেই। এরূপ কিছু সৃষ্টি হলে বা উচ্চারণ বিভ্রাট দেখা দিলে হারাম হবে। তারতীলের সাথে পড়ার পাশাপাশি, তেলাওয়াতে রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, আজাবের আয়াত আসলে তার নিকট আজাব ও বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং এগুলো থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করা, তার পবিত্রতার বর্ণনা সম্পর্কিত আয়াত আসলে سبحانه وتعالى বা جلت قدرته জাতীয় বাক্য বলে তার পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয়া মোস্তাহাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায়কালে এমনটিই করতেন। মুসলিম।

১

২

(১১) কোরআন তেলাওয়াতের একটি আদব হলো—উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করা। এটি মোস্তাহাব ও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

ما أذن الله لشيئ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهربه . رواه الشيخان.

আল্লাহ তাআলা নবীজীর উচ্চকণ্ঠে সুরেলা আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াতকে যে রূপ গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেন এরূপ গুরুত্ব দিয়ে অন্য কিছু শুনেন না।[১]

এর দ্বারা কবুল ও পছন্দ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবীজীর সুরেলা ও উচ্চকণ্ঠের তেলাওয়াতকে অন্য সকল আমলের চেয়ে অধিক পছন্দ করেন এবং কবুল করেন।

কিন্তু তেলাওয়াত কারীর কাছাকাছি যদি কেউ থাকে এবং আওয়াজের কারণে তার কষ্ট-বিরক্তি বোধ করে—যেমন ঘুমন্ত ও সালাতরত ব্যক্তি—তাহলে আওয়াজ বড় করে তাদেরকে বিরক্ত করা যাবে না।

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট এসে দেখলেন তারা উচ্চ আওয়াজে কিরাআত সহ সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন :

كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن . رواه الإمام مالك.

তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতি পালকের সাথে একান্ত কথা বলছ। অতএব কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর আওয়াজ বড় কর না।[২]

(১২) সুন্দর আওয়াজ ও সুরেলা কণ্ঠে তেলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :—

زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبوداود.

তোমরা স্বীয় আওয়াজের মাধ্যমে কোরআনকে সুন্দর কর।[৩] তিনি আরো বলেন:—

ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري.

'যে ব্যক্তি সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করে না (করাকে পসন্দ করে না) সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১] তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের টানাটানি ও স্বর দীর্ঘ করার চেষ্টা করবে না।

---

১ বোখারি ও মুসলিম।

২ বর্ণনায় ইমাম মালেক রহ.।

৩ আবু দাউদ।

(১৩) তেলাওয়াত কালে কোরআনের আদব ও ইহতেরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অহেতুক কাজ থেকে এবং চোখ, কান, এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

(১৪) ধারাবাহিক ও বিরতিহীন তেলাওয়াত করে যাওয়া। প্রয়োজন ব্যতীত মাঝখানে বিরতি না দেয়া। তবে হ্যাঁ সালামের উত্তর, হাঁচির জবাব, এবং এ জাতীয় প্রয়োজনে থামার অনুমতি আছে বরং এগুলো মোস্তাহাব, যাতে সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়। অত:পর আউযু বিল্লাহ পড়ে নতুন করে তেলাওয়াত শুরু করবে।

(১৫) সেজদার আয়াত পড়লে সেজদা করা। সেজদা ওজু অবস্থায় হতে হবে। আল্লাহ আকবার বলে সেজদায় سبحان ربي الأعلى এবং অন্যান্য দোয়াও পড়বে। সেজদার তেলাওয়াতে সালাম নেই। যদি নামাজরত অবস্থায় সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তাহলে নামাজেই সেজদা দিতে হবে। আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে উঠবে।

(১৬) কোরআন খতম করার পর দোয়া করা। যিনি কোরআন খতম করবেন তার পক্ষে দোয়া করা মোস্তাহাব। সাহাবি আনাস বিন মালেক রা. সম্পর্কে প্রমাণিত যে তিনি কোরআন খতম করলে পরিবারস্থ সকলকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে দোয়া করতেন। দারেমী।

(২) কোরআনুল কারীম হিফয করা :—

কুরানুল কারীম হিফয করা, কোরআনের গুরুত্ব প্রদান এবং তদানুযায়ী আমলের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের দলিল বহন করে। তাছাড়া একজন মুসলমানকে দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলো সুন্দর ও সার্থক ভাবে সম্পূর্ণ করতে হলে কোরআন হিফয ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাকে সালাতে ইমামতি করতে হয়। সেখানে কোরআনের প্রয়োজন। ধর্মীয় আলোচনা করতে হয়। খুতবা দিতে হয় সেখানে কোরআন থেকে দলিল উপস্থাপনার প্রয়োজন পড়ে। বাচ্চাদের হিফয করাতে হয়—এতসব কাজ করতে গেলে কোরআন হেফয না করে কি ভাবে সম্ভব ?

তাছাড়া পৃথিবীতে হাফেযে কোরআনরাই কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত সবচে বেশি করেন। তারা যখন হেফয করে তখন একটা আয়াত কতবার করে

১ বোখারি শরীফ।

পড়তে হয় ? হেফয শেষ করে ইয়াদ রাখার জন্য সারা জীবন খুব করে তেলাওয়াত করতে হয়। এছাড়া একজন হাফেযে কোরআন কোরআন মুখস্থ থাকার কারণে যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা...তেলাওয়াত করতে পারেন। যেমন সালাত, চলার পথে, গাড়িতে থাকা অবস্থায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইত্যাদি। এ সুযোগ তো হাফেয ব্যতীত অন্যরা পায় না।

এত সব কারণে কোরআন হেফয করার ফজিলত সম্পর্কে অনেক গুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

(১) কোরআন ভালভাবে হিফযকারী পূত-পবিত্র। সম্মানিত ফেরেশতাদের শ্রেণিভুক্ত। রসুলুল্লাহ সা. বলেন :—

مثل الذي يقرأ القرآن، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، مثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، وهو عليه شديد فله أجران . رواه البخاري.

হাফেযে কোরআন যিনি সব সময় তেলাওয়াত করেন তার তুলনা লেখার কাজে নিয়োজিত পূত পবিত্র, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে, আর যিনি কষ্ট স্বীকার করেও নিয়মিত তেলাওয়াত করেন, তার সওয়াব দ্বিগুণ।[১]

(২) হাফেযে কোরআন সালাতে ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। রাসূল সা. বলেন—

يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. مسلم.

'আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক পাঠকারী অভিজ্ঞরাই লোকদের ইমামতি করবে।'[২]

(৩) হাফেযে কোরআন হেফয করার মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ মাকামে আরোহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—

يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي

কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে, পড়তে থাক এবং মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাক এবং তারতীলের সাথে সুন্দর করে পড়। যেরূপ পৃথিবীতে পড়তে। নিশ্চয় তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার পঠিত আয়াতের শেষ প্রান্তে।[৩]

---

১ বোখারি।

২ মুসলিম ও শরীফ

৩ আহমদ, তিরমিজি।

এ হাদিসে তেলাওয়াতকারী বলতে হাফেযকে বুঝানো হয়েছে। এ দাবির সমর্থনে দু'টি যুক্তি পেশ করা যায়। (ক) তাকে বলা হবে— إقرأ অর্থাৎ তুমি পড়। অথচ সেখানে কোন মাসহাফ থাকবে না। (যে দেখে দেখে পড়বে)

(খ) এখানে একটি তুলনা মূলক বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি মাসহাফ থেকে দেখে দেখে তেলাওয়াত করাকেও শামিল করা হয় তাহলে এখানে তার বিশেষত্ব রইল কোথায় ? কারণ তখন তো সকল মানুষই এ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। সুতরাং এখানে হাফেযে কোরআনই উদ্দেশ্য। তেলাওয়াতকারী হাফেয তার হেফযকৃত অংশ তেলাওয়াত করে এক পর্যায়ে শেষ করে বিরতি দেয় ও থামে। এ ভাবে তার মর্যাদার আসন ও তেলাওয়াত করে সমাপ্তকৃত আয়াতের শেষ প্রান্তে।

(৪) হাফেযে কোরআনকে সম্মানের মুকুট ও মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। এবং মহান আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :—

يجيئ القرآن يوم القيامة – فيقولون يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول : يارب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يارب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارق ويزاد بكل حرف حسنة. رواه الترمذي.

কিয়ামতের দিবসে কোরআন এসে বলবে হে আমার প্রতিপালক : একে (হাফেয) পোশাক পরিধান করাও। তখন মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। এর পর বলবে হে মালিক, আরো পরাও। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অত:পর (কোরআন) বলবে : হে পরওয়ারদেগার, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন বলা হবে : পড়তে থাক এবং মর্যাদার ধাপে উন্নীত হতে থাক এবং তাকে প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে নেকি বাড়িয়ে দেয়া হবে।[১]

(৫) কোরআন মজিদ হেফয করা মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার উৎকৃষ্ট ও পবিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রশংসিত ঈর্ষণীয় ক্ষেত্র বা বস্তু। নবী সা. বলেন—

لاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه.

একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কোরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা রাত্রি ঐ কোরআন.তেলাওয়াতে ব্যস্ত

১ তিরমিজি শরীফ

থাকে। দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে তা দিনরাত (বৈধ কাজে) খরচ করে।[১]

হাদিসে বর্ণিত হাসাদ (হিংসা) এর অর্থ এখানে গিবতাহ। (ঈর্ষা) হাসাদ ও গিবতাহর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—গিবতাহ বলা হয় :—

تمنى النعمة له مع عدم تمنى زوالها عن الغير.

অর্থাৎ অপরের নেয়ামত দেখে সেটি ধ্বংস ও নি:শেষ হয়ে যাওয়ার কামনা না করেই নিজের মধ্যে অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। আর হাসাদ বলা হয়—

تمنى زوال النعمة عن الغير

অর্থাৎ কারো নেয়ামত দেখে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা। এবং অন্তর জ্বালায় ভুগতে থাকা।

কোরআন হেফয করার এতসব মর্যাদা ও সম্মান ; তাই সংগত কারণেই সকল মুসলমানের উচিত হবে স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী কোরআন হেফয করার এ মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করা। পূর্ণ কোরআন না হোক অন্তত যেটুকু পারা যায় সেটুকুই হোক। একে বারে কিছু না হওয়ার চেয়ে অল্প হোক তাও ভাল। এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম ও প্রধান আদর্শ হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সা.—যিনি সর্ব প্রথম কোরআন হেফযকারী। অত:পর তার সাহাবিবৃন্দ রা. যাদের মধ্যে অনেক হাফেয ছিলেন। কেউ পূর্ণ কোরআন হেফয করেছেন আবার কেউ কিছু অংশ।

বিরে মাউনার যুদ্ধেই তাদের সত্তরজন শহীদ হয়েছেন আর নবুয়্যতের ভণ্ড দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাব-এর সাথে সংঘটিত ইয়ারমুক লড়াইয়ের আরো সত্তরজন।

বিশেষ করে বর্তমান যুগে হেফয করা কত সহজ হয়েছে, যা বিগত দিনে তাদের যুগে ছিল না। বর্তমানে সুন্দর সুন্দর ছাপার মাসহাফ রয়েছে বাজারে। হেফযের প্রশিক্ষকগণ অধিকহারে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি নিয়ত। এছাড়া আরো বহু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যা কোরআন হেফয করাকে অতি সহজ করে দিয়েছে। তাই আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার। এতে করে আমাদের হৃদয় আল্লাহর জিকির দ্বারা আবাদ থাকবে।

---

১ বোখারি, মুসলিম

এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া এবং তাদেরকে কোরআন হেফয করানোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা ছোটরা হেফযের ক্ষেত্রে বড় ও বয়স্কদের চেয়ে অধিক সামর্থ্যবান। প্রবাদ আছে :

الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر.

ছোট বয়সে হেফয করা যেমন পাথর খোদাই করে চিত্রাঙ্কন করা। এ বয়সে তাদের মন মস্তিষ্ক থাকে পরিষ্কার। সময় পায় প্রচুর। অবসরে থাকে বিস্তর সময়। তা ছাড়া আমরা তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাআলা বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحريم:٦)

হে মোমিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না, এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।[১]

তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, কোরআনুল কারীমের শিক্ষা দেয়া, এবং এটিই হেদায়াত ও হেদায়াতের উপর অটল অবিচল থাকার বড় মাধ্যম এটি এমন একটি ফলদায়ক আমল যার কার্যকারিতা মৃত্যুর পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

কোরআন হেফয করা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হেফয সমাপন করার পর তা ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি ও বার বার তেলাওয়াত করা। কেননা কোরআন স্মৃতি থেকে খুব দ্রুত হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه،

'তোমরা কোরআন তেলাওয়াতে খুব যত্নবান হও। কসম সে সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, নিশ্চয় কোরআন রশিতে বাধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর।[২]

১ সূরা : তাহরীম : ৬

২ বোখারি-মুসলিম।

তৃতীয়ত: কোরআন বুঝা ও গবেষণা করা :—

কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত ও হেফয করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার জো নেই। তবে শুধুমাত্র তেলাওয়াত ও হেফযই যথেষ্ট নয়। কারণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন নাজিল করেছেন তদনুযায়ী আমল করার জন্য। আর না বুঝে আমল করা অসম্ভব। এমনি করে বুঝার জন্য চিন্তা ও গবেষণা অপরিহার্য। গভীর চিন্তা ও গবেষণা ব্যতীত কোরআন থেকে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ . (ق:٣٧)

'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।'[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবিত ও সক্রিয় অন্তর সম্পন্ন লোক ছাড়া কেউ কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴿٧٠﴾. (يس-٦٩-٧٠)

'এটি একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন বৈ অন্য কিছু নয়। যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতকে।'[২]

এখানে জীবিত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন্ত অন্তর। কোরআন বুঝার জন্য জীবন্ত অন্তরের পাশা পাশি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমনি ভাবে প্রয়োজন রয়েছে পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে মনোযোগী হওয়ার। অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে ও অন্য ধ্যানে মগ্ন হয়ে কোরআন শোনাতে কোন লাভ নেই। এতে কিছুই বুঝে আসবে না বরং তার জন্য প্রয়োজন সব কিছু থেকে ফারেগ হয়ে এক মনে ও এক ধ্যানে নিমগ্ন থাকা ও গভীর মনোযোগী দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাদাব্বুর তথা চিন্তা ও গবেষণার অর্থ হচ্ছে, কোরআনের অর্থ ও তাৎপর্য, প্রমাণ ও নির্দেশনা, ঘটনাবলী ও কিচ্ছা কাহিনি, শিক্ষা ও উপদেশ এবং আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করা। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বহু জায়গায় এরূপ চিন্তা ও গবেষণাকে ওয়াজিব বলে বর্ণনা করেছেন. যেমন এ জায়গায় বলেন :—

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ (ص:٢٩)

---

১ সূরা : ক্বাফ : ৩৭

২ সূরা : ইয়াসীন : ৬৯-৭০

এটি একটি কল্যাণময় কিতাব। যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[১] মুনাফেকদের প্রত্যাখ্যান করে বলেন :—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ (محمد:٢٤)

'তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'?[২]

বুঝা যাচ্ছে : কোরআন অনুধাবন ও চিন্তা গবেষণা পরিত্যাগ করার কারণে মুনাফেকদের সাথে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

তাদাব্বুর সহায়ক কিছু বিষয়াদি:—

এমন অনেকগুলো বিষয় আছে যা কোরআন গভীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা ও অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এর কিছু নিম্নে আলোচনা কর হল।

কিছু কিছু অর্থবহ আয়াত বার বার ঘুরে ফিরে তেলাওয়াত করা। এতে পরবর্তী তেলাওয়াতে এমন কিছু নতুন অর্থ ও তাৎপর্য মনে ভেসে উঠবে যা পূর্বের তেলাওয়াতে হয়নি এভাবে যতবার গভীর চিন্তাসহ পড়া হবে ততবার কিছু না কিছু নতুন বিষয় বুঝে আসবে। তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে এসেছে—রাসূল সা. রাতের সালাতে একটি আয়াত পড়েছেন এবং এটিই বার বার পড়তে পড়তে সকাল করে ফেলেছেন, আয়াতটি হচ্ছে—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾. (المائدة:١١٨)

'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনিই পরাক্রান্ত, মহা বিজ্ঞ।'[৩]

সাহাবি তামীম আল-দারী নিম্নোক্ত আয়াত বার বার তেলাওয়াত করেছেন—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ . (الجاثية: ٢١)

---

১ সূরা : ছোয়াদ : ২৯

২ সূরা মুহাম্মদ : ২৪

৩ সূরা : মায়েদা : ১১৮

'দুষ্কর্ম সম্পাদনকারীরা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সে সব লোকদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? তাদের সিদ্ধান্ত ও দাবি কত মন্দ!'[১]

সালাফে সালেহীনদের ব্যাপারে এরূপ অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

(খ) তাড়া-হুড়া না করে ধীরে ধীরে পাঠ করা। রাসূল সা. এর তেলাওয়াত ও পঠন পদ্ধতি এমনই ছিল, সালাতেও তিনি এভাবেই পাঠ করতেন। সাহাবি হুযায়ফা রা. বর্ণনা করছেন :—

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح، (رواه الترمذي)

'রাসূলুল্লাহ সা. সালাত আদায় করতেন। যখন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন তখন আল্লাহর পবিত্রতা ও দোষ ত্রুটি মুক্ত হওয়ার বর্ণনা সংবলিত আয়াত আসলে তার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন।'[২] এটিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ—

ورتل القرآن ترتيلا.

তারতীলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত কর। এর বাস্তবায়নে সাহাবি ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

لأن أقرأ سورة أرتلها، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله.

তারতীলের সাথে একটি সূরা তেলাওয়াত করা আমার নিকট (তারতীল বিহীন) পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

(গ) বিশ্লেষণ সহ অর্থ জানার চেষ্টা করা। কেননা অর্থ চিন্তা ও একাগ্রতায় সহায়ক।

(ঘ) তেলাওয়াতের আদব রক্ষা করে তেলাওয়াত করা।

(ঙ) তাদাব্বুর তথা চিন্তা ও গবেষণার ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে জানা। যেমন, একাগ্রতা ও নম্রতা সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর ভয়ে কান্না কাটি করা। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এখন বিষয়টি সকলের নিকট পরিষ্কার হল যে, শুধুমাত্র পঠন ও খতম করাই উদ্দেশ্য নয় আর এটিতো খুবই সহজ কাজ বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বুঝা এবং বিধি-বিধান শিক্ষা করা।

---

১ সূরা : জাছিয়া:২১

২ তিরমিজি শরীফ

এ নীতিই ইবনে ওমর রা. কে বাধ্য করেছিল যে, তিনি সূরা বাকারা পূর্ণ আট বৎসরে শিখেছেন। এমনটিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক রহ. তার মুয়াত্তা গ্রন্থে।

কোরআন পাঠকারী যখন তার পঠিত আয়াতগুলো গভীর চিন্তা করে অনুধাবন করতে থাকে তখন সে অন্য জগতে চলে যায়, তার অন্তর পরকালের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং এমন এক মজা অনুভব করতে থাকে যে পার্থিব ঐশ্বর্য বা তার কষ্টকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয় এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে দেয়। এ জন্যইতো নবী কারীম সা. বলেছিলেন—

(يابلال أقم الصلاة وأرحنا بها)

'হে বেলাল সালাতের একামত দাও এবং এর মাধ্যমে আমাদের আরাম পৌঁছাও।' আবু দাউদ। এবং তিনি নিজ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

وجعلت قرة عيني في الصلاة.

'আমার চক্ষুর শীতলতা রয়েছে সালাতে।'

এ প্রসঙ্গে আব্বাদ বিন বিশরের ঘটনাটি কত না চমৎকার। ঘটনার বিবরণ হচ্ছে—

كان عباد بن بشر يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ليلا، فقام يصلي، فرماه رجل بسهم، ثم بسهم ثان، ثم بثالث، فأكمل صلاته، وأيقظ صاحبه في الحراسة عمار بن ياسر، فقال له لما رأى مابه من الدم: سبحان الله، أفلا أيقظتني أول ما رماك، قال عباد: كنت في سورة أقرأ، فلم أحبب أن أقطعها، ووالله لو لا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، لقطع نفسي قبل أن قطعها أو أنفذها.

তিনি নবী করীম সা. ও সাহাবাদের রাতের বেলায় পাহারা দিচ্ছিলেন, (এমনি বসে না থেকে) নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। (শত্রু পক্ষের) এক লোক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। অত:পর আরো একটি। তিনি নামাজ শেষ করে পাহারার কাজে তার সাথি আম্মার বিন ইয়াসির রা.-কে ডেকে তুললেন। আম্মার তার শরীরে রক্ত দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ, প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে ডেকে তুললে না কেন ? আব্বাদ বললেন, একটি সূরা পড়ছিলাম, শেষ না করে তেলাওয়াত বন্ধ করতে মন চাইছিল না, আল্লাহর কসম করে বলছি। রাসূলুল্লাহ সা.

যে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যদি সেটি ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার প্রাণস্পন্দন বন্ধ হত।

চতুর্থ: কোরআন অনুযায়ী আমল :—

কোরআন নাজিলের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাতে বর্ণিত তথ্য ও সংবাদ বিশ্বাস করা। বিধানাবলীর অনুসরণ করা। নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং নিষেধাবলী পরিহার করা। মহান রব্বুল আলামীন বলছেন—

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. (الأنعام:١٠٦)

'আপনি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদেশের অনুসরণ করুন।' অন্যত্র বলেন :—

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. (الأعراف : ٣)

তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না।[১]

সাহাবা কেরাম (রা:) রাসূল সা. থেকে দশটি আয়াত শিখতেন। আয়াতে বর্ণিত জ্ঞান ও আমল আত্মস্থ করার পূর্বে অন্য আয়াত আর শিখতেন না। তারা বলতেন : আমরা কোরআন ইলম এবং আমল সবগুলো একত্রে শিখেছি। মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, কল্যাণ ও অকল্যাণের কেন্দ্র-বিন্দু হচ্ছে কোরআনের ইত্তেবা ও অনুসরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾ (طه:١٢٣-١٢٧)

'এর পর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথ ভ্রষ্ট ও কষ্টে পতিত হবে না (দুর্ভাগা হবে

১ সূরা : আরাফ_ ৩

না) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্থিত করব। সে বলবে হে আমার পালনকর্তা, আমাকে অন্ধকরে কেন উত্থিত করলেন ? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন : এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমন করে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। যে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং সীমা-লঙ্ঘন করে, তাকে এমন প্রতিফলই দেব। আর পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর, অনেক স্থায়ী।[১]

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো পথের অনুসরণ করবে, কোরআনকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবে তার জন্যই মূলত রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়াত ও শান্তি। সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখেরাতে দুর্ভাগা হবে না। কোরআন তার জন্য হবে পথপ্রদর্শক, হুজ্জত এবং সুপারিশকারী।

পক্ষান্তরে যারা তোয়াক্কা করবে না। তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে খুব কষ্ট করে। অস্বস্তি ও পেরেশানীতে—

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. (الأعراف:١٧٩)

'তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্য পরায়ণ।'[২]

কবরে থাকবে নিদারুণ শাস্তিরত অবস্থায়। কবর তাদের জন্য হবে খুব সংকীর্ণ। পাঁজরের হাড্ডি গুলো একটি অপরের মধ্যে ঢুকে যাবে।

আর পরকালে উত্থিত হবে অন্ধ হয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا . (الإسراء: ٩٧)

'আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য তা আরও বৃদ্ধি করে দেব।[৩]

---

১ সূরা ত্ব-হা:১২৩-১২৭

২ সূরা : আরাফ:১৭৯

৩ সূরা : ইসরা : ৯৭

অন্ধ করে দেয়ার এ শাস্তি তাদের অপরাধের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কারণ তারাও পৃথিবীতে হক ও সত্য থেকে অন্ধ হয়ে থাকত।

তাদের বিরুদ্ধেই কোরআন হুজ্জত হবে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم.

'কোরআন হয়তো তোমার পক্ষের দলিল হবে অথবা বিপক্ষে।'[১] সাহাবি ইবনে মাসউদ রা বলেন:—

القرآن شافع مشفع ، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار.

'কোরআন এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি কোরআনকে তার সামনে রাখবে কোরআন তাকে টেনে জান্নাতে পর্যন্ত নিয়ে যাবে আর যে পিছনে রাখবে কোরআন তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।'

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের রা. কিংবদন্তি বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল:—

(১) মদ হারাম করে যখন আয়াত নাজিল হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المائدة:٩٠-٩١)

'হে মোমিনগণ ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা, এবং ভাগ্য নির্ধারণী শরসমূহ— এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে, অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না?' (এ আয়াত শুনে) সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে বলে উঠলেন انتهينا ربنا হে আমাদের প্রতি পালক আমরা নিবৃত হয়ে গিয়েছি।

১ মুসলিম।

মদ হারাম করা হয়েছে মর্মে খবর যার নিকটই পৌঁছেছিল সাথে সাথেই তার নিকট রক্ষিত মদ ঢেলে ফেলে দিয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে মদিনার গলিতে মদের সয়লাব বয়ে গেল। খবর শোনার সাথে সাথে বিলম্ব না করেই মদ্য-পান ছেড়ে দিলেন। এমন একজন পাওয়া গেল না যে বলেছিল— أغتنم الوقت وأشرب هذا الكأس এ সময় ও সুযোগটি কাজে লাগাই। এ পেয়ালাটি শেষ করে নেই। বরং শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ পান বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(২) মুনাফেকরা যখন আয়েশা রা. এর উপর অপবাদ দিয়েছিল এতে কিছু মুসলমান ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন। এদের একজন অতিশয় দরিদ্র ও নি:স্ব। আবু বকর রা. তার খরচ চালাতেন। তার নাম ছিল মিসতাহ। তিনি যখন শুনলেন, মিসতাহ মেয়ে আয়েশার ব্যাপারে অপবাদে শামিল হয়েছে, তখন তার খরচ দেয়া বন্ধ করে দেবেন মর্মে শপথ করলেন, এসময় আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (النور:٢٢)

'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।'[১] এ আয়াত শুনে আবু বকর রা. বলেন :—

بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا ربنا. হ্যাঁ অবশ্যই হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা কামনা করি তুমি আমাদের ক্ষমা করবে। অত:পর মিসতাহর খরচ ও সম্পর্ক পূণ:বহাল করলেন। এবং বললেন :

و الله لا أنزعنها منه أبدا.

আল্লাহর কসম ! আর কখনও তার খরচের ধারা বন্ধ করব না। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে কাছির)

(৩) যখন অবতীর্ণ হল

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ . (الحديد:١١)

---

১ সূরা নূর : ২২

‘কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে ? এরপর তিনি তার জন্য তা বহু গুনে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।’

—এ আয়াত শুনে আবু দাহদাহ আনসারী রা. ছয় শত খেজুর গাছ বিশিষ্ট তার বাগান সদকা করে দিলেন। সে বাগানেই তাঁর স্ত্রী ও পরিবার বসবাস করতেন। সদকার ঘোষণা দিয়ে বাগানে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন : এখান থেকে বের হয়ে আস। আমি একে আল্লাহর জন্য ঋণ দিয়েছি ; শুনে স্ত্রী বললেন : হে আবু দাহদাহ, আপনার ব্যবসা লাভজনক হোক। অত:পর তার মাল-সামান ও সন্তানাদি সেখান থেকে বের করে আনলেন।[১] সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইবনে দাহদাহের সালাতে জানাজা পড়ে বললেন :

كم من عذق معلق (أو مدلى) في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: (لأبي الدحداح)

অনেকগুলো খেজুরের গুচ্ছ ইবনে দাহদাহের অপেক্ষায় রয়েছে। হাদিসের একজন রাবী শুবা বলেন : অথবা রাসূল সা. বলেছেন. আবু দাহদাহের জন্য। সাহাবি আবু তালহা রা. সূরা তাওবা তেলাওয়াত করছিলেন, যখন পড়লেন :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .(التوبة:٤١)

‘তোমরা বের হয়ে পড় হালকা (লঘু রণ অবস্থায়) বা ভারী (প্রচুর রণ সরঞ্জাম সহ) অবস্থায়। এবং জিহাদ কর আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের মাল এবং জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।’

তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি আমার প্রতিপালক আমাদের বৃদ্ধ ও যুবকদের থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। বৎস ! আমাকে তৈরি করে দাও। ছেলেরা বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন ! আপনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জেহাদ করেছেন। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়ে যায়। অত:পর আবু বকরের সাথে জেহাদ করেছেন তার মৃত্যু অবধি। এর পর ওমর রা. সাথে জেহাদ করেছেন। তারও মৃত্যু হয়ে গেছে। তিনি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধের জন্য সৈনিক হিসাবে সমুদ্র পথে যাত্রা করলেন। এ অবস্থাতেই একসময় তার মৃত্যু হয়। লোকেরা দাফন করার জন্য কোন মাটি (দ্বীপ) খুঁজে পাচ্ছিল না। নয় দিন পর দ্বীপ পাওয়া গেল। এ নয় দিনে তার শরীর চেহারার কোন রূপ পরিবর্তন আসেনি। অত:পর তারা সেখানেই তাকে দাফন করে।

---

১ আহমদ

(৫) এক্ষেত্রে মুসলিম রমণীরাও পিছিয়ে থাকেননি, তাদের মধ্যেও আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়ার একরকম প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হত। উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করছেন। যখন আল্লাহর বাণী—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. (الأحزاب:٥٩)

'হে নবী : আপনি আপনার পত্নী, কন্যা ও মোমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়।'[১]

—নাজিল হয়।

خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية يلبسونها. رواه ابن حاتم

'আনসারী রমণীবৃন্দ এমন শান্ত ও ধীরস্থিরতার সাথে বের হতেন যেন তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে, এবং তাদের উপর বস্ত্র থাকত যা তারা পরিধান করতেন।'(ইবনে আবী হাতেম)

চতুর্থ: কোরআন বর্জন করা

যারা আল্লাহর কিতাব কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত বর্জন করে, তাতে গভীর চিন্তা ও অনুধাবন করে না, কোরআনের নির্দেশনা মতে বিচার ও শাসন করে না এবং তার দ্বারা সমস্যার সমাধান করে না—মোট কথা সার্বিকভাবে কোরআন বর্জন ও উপেক্ষা করে চলে তাদের ব্যাপারে সমূহ আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা রাসূলের অভিযোগের আওতাভুক্ত হবে, যখন তিনি স্বীয় প্রতি পালকের নিকট তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোরআন উপেক্ষার অভিযোগ এনে এবং এ ব্যাপারে আক্ষেপ আফসোস করে বলবেন—

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا . (ألفرقان : ٣٠)

'রাসূল বলবেন : হে প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করেছে।'[২]

---

১ সূরা আহযাব : ৫৯

২ সূরা : ফুরকান : ৩০

অর্থাৎ তারা একে উপেক্ষা করে পরিত্যাগ করেছে অথচ তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, এর বিধানের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার আহ্বানগুলো গ্রহণ করা ও তার নির্দেশিত পথে চলা। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. (الفرقان:٣١)

'এমনি ভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'[১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: কোরআন উপেক্ষা ও পরিত্যাগ কয়েক ভাবে হতে পারে।

(এক) কোরআন শ্রবণ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও মনোযোগ প্রদান বর্জন করা।

(দুই) কোরআন অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা এবং তার হালাল ও হারামকে অবজ্ঞা করা। যদিও পাঠ করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে।

(তিন) দ্বীনের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কোরআনের ফয়সালা পরিত্যাগ করা এবং এবং কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রার্থনা না করা। এবং এ ধারণা পোষণ করা যে কোরআন ইয়াকীনের ফায়দা দেয় না ও তার দলিলাদি লফযী এতে কোন জ্ঞান নেই।

(চার) কোরআনের প্রতি গভীর চিন্তা, অনুধাবন ও তাকে বুঝার চেষ্টা না করা এবং এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য কি তা জানার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা।

(পাঁচ) শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে কোরআনের চিকিৎসা গ্রহণ না করে এ সব ক্ষেত্রে কোরআনকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে অন্যের প্রতি ধাবিত হওয়া। এ সব কিছুই আল্লাহর বাণী :

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ (ألفرقان : ٣٠)

'রাসূল বলবেন : হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এ কোরআনকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছিল এর অন্তর্ভুক্ত।[২] অবশ্য কোন কোন উপেক্ষা ও বর্জন অন্য গুলোর চেয়ে সহজ।' (কিতাবুল ফাওয়াদ)

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট অপদস্ত ও বঞ্চিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

---

১ সূরা : আল ফুরকান- ৩১

[২] সূরা : আল ফুরকান-৩০

অতি প্রয়োজনীয় পাঁচটি মৌলিক বস্তুর শরিয়তের সংরক্ষণ

পাঁচটি অতি জরুরি বস্তুর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল শরিয়ত একমত। সব শরিয়তই এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব যত্ন নিয়েছে। ইমাম শাতেবী রহ. বলেন : সকল উম্মত বরং সকল জাতি ও ধর্ম এ বিষয়ে একমত যে, শরিয়তের প্রবর্তনই হয়েছে অতি প্রয়োজনীয় পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। বিষয়গুলো হচ্ছে :—

١ – الدين ٢ – النفس ٣– النسل ٤ – المال ٥ – العقل

১- দ্বীন (ধর্ম)
২- জীবন ও প্রাণ
৩- বংশধর
৪- সম্পদ
৫- বোধ-বুদ্ধি।

যারা আল্লাহর কিতাব কোরআনুল কারীম গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন তারা অবশ্যই দেখতে পাবেন যে আল্লাহ তাআলা অনেক স্থানে বহুবার তিনটি মারাত্মক কবীরা গুনাহকে এক সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে—শিরক, হত্যা, এবং যিনা-ব্যভিচার। কারণ এ তিনটি বস্তুই কদর্যতা, জাতি-বিনাশ এবং প্রজন্ম-ধ্বংস করার দিক থেকে এক সমান। কেননা এগুলোর মাধ্যমে সুস্থ প্রকৃতি, সচ্চরিত্র ও মূল্যবান প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে। যে সমাজে এসব মারাত্মক অপরাধের বিস্তার ঘটে সে সমাজ মূলত ধ্বংস ও বিনাশের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। কারণ সে সমাজ মৌলিক সামাজিক অবকাঠামোই হারিয়ে ফেলে। এ কারণে অতীতের অনেক সভ্যতা বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, পরবতীতে আর কখনো অস্তিত্বে আসতে পারেনি। এত দ্রুত পতন ও বিধ্বস্ত হওয়ার কার্যকারণ অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করলে দেখা যায় ঐ জরুরি বিষয়গুলোর সংরক্ষণ ও যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন ও অবহেলাই একমাত্র কারণ। সুতরাং শরিয়তের ভিত্তি এ জরুরি বিষয়গুলোর উপর অহেতুক হয়নি বরং এটিই তাৎপর্যপূর্ণ এবং কল্যাণময়।

সম্মানিত পাঠক ! আমরা এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। গুরুত্বের বিবেচনায় এবং শরিয়তের বিন্যাসের আলোকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

প্রথমত: দ্বীনের সংরক্ষণ :

দ্বীন বা ধর্মের কল্যাণ ও উপকার সকল কল্যাণ ও উপকারের উর্ধ্বে। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় সঠিক ও কল্যাণকর হওয়া নির্ভর করে দ্বীনের উপর। দ্বীন ব্যতীত বান্দার কোন বিষয়ই সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে না। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, দ্বীনের সংরক্ষণ অতীব জরুরি—এ মর্মে সকল বিষয়ই হচ্ছে দ্বীন। আর কোরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য দুটি কাজ করা জরুরি। ঐ দুই কাজ ব্যতীত উক্ত আদেশ (কোরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা) পালন হয়েছে বলে প্রমাণ করা যাবে না। কাজ দুটোর একটি হচ্ছে الفعل বা করা। দ্বিতীয়টি الترك বা বর্জন করা। الفعل বা করা, এর মর্মার্থ হচ্ছে দ্বীনের আরকান কায়েম করা ও ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত করা। এটি আমলের মাধ্যমেও হতে পারে আবার হুকুমের মাধ্যমেও, দাওয়াতের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার জিহাদের মাধ্যমেও। মোটকথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশগুলো যে কোন ভাবে বাস্তবায়ন করা।

আর الترك বর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষতিকর ও অনৈতিক কার্যাদি পরিহার করা। এবং যে সকল কাজের মাধ্যমে দ্বীনের ভিতর ঘাটতি ও ত্রুটি সৃষ্টি হয় যেমন বেদআত ও এ জাতীয় গুনাহ বা দ্বীন বিলকুল বিনষ্ট হয়ে যায়- যেমন স্বধর্ম ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া—ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুকম্পা ও রহমত যে, তিনি দ্বীন সংরক্ষণের উপায় হিসাবে অনেকগুলো পন্থার অনুমোদন এবং অনেকগুলো আইনের প্রবর্তন করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটির আলোচনা করা হল।

(১) ইবাদত ও নেক কাজ অপরিহার্য ভাবে করা এবং গুনাহ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .(الأنعام:١٥٣)

'এবং নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।'[১]

(২) দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার বেদআতের প্রচলন করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং বেদআতপন্থী, যাদুকর ও এ জাতীয় ভণ্ড পাপীদের শাস্তি প্রদানের ঘোষণা প্রদান।

(৩) ধর্মত্যাগী মুরতাদদের হত্যার বিধান।

(৪) জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের হুকুম।

দ্বিতীয়ত : জীবনের হেফাজত

জীবন ও প্রাণের হেফাজত একটি অতীব জরুরি ও মৌলিক বিষয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর বিভিন্নভাবে অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। পরিপূর্ণ অবয়ব ও সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়কল্পে অবশ্যই জীবনের নিরাপত্তা ও হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এবং যে সকল জিনিস জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করে বা বিপন্ন করে তা থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এ কারণেই নিজেকে হত্যা করতে পারবে না এবং হত্যার কারণও হতে পারবে না। সাথে সাথে অপরের ক্ষতি করা যাবে না যার ফলে নিজের জীবন দিতে হয়। হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। এসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .(النساء:٢٩)

'তোমরা নিজেদের হত্যা কর না নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।'[২] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .(النساء:٩٣)

---

১ সূরা আন আম : ১৫৩

২ সূরা : নিসা - ২৯

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[১]

কাউকে হত্যা করা হাদিসে বর্ণিত ধ্বংসাত্মক সাত কাজের একটি। নবী কারীম সা. হত্যার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما.

'মোমিন সব সময় তার দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদে থাকবে যতক্ষণ না সে অবৈধ ভাবে প্রাণ সংহার না করে।'[২]

তৃতীয়ত : বংশধরের হেফাজত

সন্তান ও বংশধরের হেফাজত জীবনের মৌলিক জরুরিয়্যাতের অন্যতম। এটি ধরা পৃষ্ঠ আবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক। উম্মতের শক্তি ও বল এর মধ্যেই নিহিত। এজন্যই ইসলাম দু ভাবে বংশধর হেফাজতের গুরুত্ব দিয়েছে।

(১) ইতিবাচক দিক : আর সেটি বংশধরের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান রাখা ও বংশ বিস্তারের পরিধি বিস্তৃত ও বৃদ্ধি করার উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। যেমন বিবাহের নির্দেশ দান, পরিবার গঠনের প্রতি গুরুত্ব দান বিভিন্ন ভাবে এর প্রতি উৎসাহিত করা।

(২) নেতিবাচক দিক :

আর তা যিনা ব্যভিচার হারাম করে। তার উপর কঠোর শাস্তির বিধান এবং দৃষ্টি, সহ অবস্থান, অবাধ মেলামেশা জাতীয় যিনা-ব্যভিচারের প্রতি আকর্ষনকারী উপায় উপকরণ হারাম ও নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .(النور:٣٠-٣١)

'হে নবী আপনি মোমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে, নিশ্চয় তারা যা

---

১ সূরা : নিসা : ৯৩

২

করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন ঢেকে রাখে যা সাধারণত: প্রকাশমান, তাছাড়া নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন স্বীয় মাথার উড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।[১]

প্রজ্ঞাময় মহান রব্বুল আলামীনের বিশেষ একটি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা হচ্ছে, তিনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে এমন এক প্রকৃতি ও মেজাজ স্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে সাময়িক ভাবে মানব ধারার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব চলমান থাকবে। এবং সাথে সাথে তাকে কিছু নিয়মনীতি দ্বারা শর্তাধীন করেছেন যা মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করতে বাধা প্রদান করে এবং অবাধ্যতার লাগাম টেনে ধরে। যেমন সমকামিতা বা নিজের যিনার অপবাদ দিয়ে মানুষের সম্মান বিনষ্টে প্রবৃত্ত হওয়াকে হারাম করেছেন। এবং প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বিধান, এ পাপাচার প্রতিকারের জন্য প্রথমেই ভয়ানক শাস্তির রাস্তা গ্রহণ করেননি। বরং এর পূর্বেও নিষিদ্ধ ও হারাম কর্মে পতিত হওয়া থেকে বাধাদানকারী কিছু বিশেষ ও শক্তিশালী নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছেন যার মাধ্যমে মানুষ উক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে। সুতরাং বিধান দিয়েছেন এবং সাথে সাথে আদব ও শিষ্টচারের প্রতিও পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন দৃষ্টি অবনত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরিচিত নারী পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়াকে হারাম করেছেন। নারী পুরুষের সহ অবস্থান ও মেলামেশা, নারীদের খোলামেলা বের হওয়া এবং মুহরিম ব্যতীত সফর করা—ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

চতুর্থত: বিবেক ও বোধবুদ্ধির হেফাজত

বোধবুদ্ধি ও বিবেক আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান ও বিশাল অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা এ নেয়ামত শুধু মানুষকে দান করে অন্যান্য জীব জন্তু থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও সম্মানিত করেছেন। মানুষ যখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তখন সে চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যায়। বিবেকের যত্ন নেয়া, হেফাজত করা এবং তাকে সুস্থ ও সচল রাখার আগ্রহ ও বাসনা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, তার প্রকৃতিতেই এ ধারা গেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সকল ধী সম্পন্ন মানব সন্তান সব সময় এ চর্চা করে আসছে। সকল শরিয়ত বিবেকের হেফাজত ও তার প্রতি যথাযথ যত্ন নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, মানুষকে শরিয়তের মুকাল্লাফ তথা দায়িত্বশীল বানানোর ক্ষেত্রে

১ সূরা : নূর:৩০-৩১

বিবেকই হচ্ছে মূল কেন্দ্র-বিন্দু। সে বিবেকের মাধ্যমেই মানুষ উপকারী ও অপকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাইতো বিবেকহীন ব্যক্তিকে শরিয়তের দায়িত্বশীল বানানো হয় না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা যে সকল দ্রব্য বিবেককে ধ্বংস অথবা ত্রুটি যুক্ত করে দেয় তাকেও হারাম করেছেন।

বিবেক বিনষ্টকারী জিনিস প্রথমত দুই প্রকার:—

(১) حسي যা দেখা যায় ও অনুভব করা যায়। যেমন মাদকদ্রব্য। এগুলোই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল চাবি-কাঠি। এগুলোর কারণে কত বিবেক নষ্ট হচ্ছে, কত অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

মদের জঘন্য অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۔ (المائدة:٩١)

'শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না ?'[১]

(২) معنوي আভ্যন্তরীন যা বাহ্যত দেখা যায় না। তবে বিবেক বিনষ্ট করে। যেমন : মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা অসীম তার জ্ঞান ও ক্ষমতার কোন সীমারেখা নেই। এরূপ অনেক বিষয় আছে যা আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট। মানুষ চিন্তা করে সেগুলো করতে পারে না। এবং তাতে মানুষের কোন ফায়দাও নেই। এরূপ বিষয়ে যদি মানুষ চিন্তা ও কল্পনা শুরু করে দেয় যেগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া মূলত তার ক্ষমতার বাইরে তাহলে আস্তে আস্তে তার বিবেক লোপ পেতে থাকে এবং বোধ ও অনুভূতি নষ্ট হতে শুরু করে। সুতরাং এরূপ অসার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমেও মানুষের বিবেক নষ্ট হয়। সুতরাং বিবেক নষ্ট হওয়ার কারণ দুইটি। মদ ও মাদক দ্রব্যে আক্রান্ত হওয়া। অহেতুক ও ক্ষমতার বাইরের বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া। অতএব বিবেকের সংরক্ষণের জন্য এ উভয়প্রকার বিধ্বংসী কার্যকারণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

পঞ্চমত : মাল সম্পদের সংরক্ষণ:—

১ সূরা : মায়েদা : ৯১

সম্পদ মানব জীবনের এমন একটি প্রয়োজনীয় জিনিস যা ব্যতীত মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না, চলার গতি ঠিক থাকে না। বরং সম্পদ ব্যতীত মানুষ বাঁচতেই পারে না। সম্পদ জীবনের নার্ভ ও শিরা। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (النساء :٥)

'আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিয়ো না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও ও পরিধেয় প্রদান কর এবং তাদের সাথে ভাল ভাল কথা বল।'[১]

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রেই সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মাল ও সম্পদ বলতে এখানে ঐ সকল জিনিসকেই বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে, জমা করে, সঞ্চয় করে এবং ভোগ করে। এটি দ্রব্য সামগ্রীও হতে পারে আবার অর্থ কড়ি ও হতে পারে বা এ জাতীয় অন্য কিছুও হতে পারে। শরিয়ত সম্পদকে দুই ভাবে সংরক্ষণ করেছে:

(১) ইতি বাচক পদ্ধতিতে : আর সেটি সম্পদ উপার্জন অনুমোদিত পন্থায় খরচ করার উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে।

(২) নেতিবাচক পদ্ধতিতে :

আর সেটি সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন ও বাড়া বাড়িকে হারাম, এ পন্থা রোধ এবং চোর বাটপার দুর্নীতি বাজদের শাস্তি ও দণ্ডবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে।

শরীয়তে ইসলামিয়া অপরাধের বিপরীতে দণ্ডবিধান করার ক্ষেত্রে একটি মাপকাঠি ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছে যে, যে অপরাধের শাস্তি যতটুকু হলে অপরাধ বন্ধ হবে এবং অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ঠিক ততটুকু শাস্তি রই বিধান করা হয়েছে একটুও বাড়াবাড়ি করা হয়নি। আর হবেই বা কেন ? এ যে প্রজ্ঞাময় বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার প্রবর্তন।

---

১ সূরা : নিসা : ৫

আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকার
(সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ)

المعروف এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : المعلوم বা জ্ঞাত ও জানা বস্তু বা বিষয়। عرف يعرف معرفة وعرفانا এর অর্থ জানা। معروف এর বিপরীত হল المنكر বা অজ্ঞাত ও অপরিচিত।

المعروف শব্দটি المعرفة (জানা) এবং الاستحسان (কল্যাণকরন) উভয়কে শামিল করে।

শরিয়তের পরিভাষায় মা'রুফ বলা হয় :—

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه، بفعل الواجبات والمندوبات.

অর্থাৎ যে সকল ফরজ ও নফল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং নৈকট্য সাধিত হয় তাকে মারূফ বলে।

আর মুনকার হচ্ছে মারূফের বিপরীত وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه এমন কথা ও কাজ যাকে শরিয়ত হারাম, অপছন্দ ও ঘৃণা করে হারাম সাব্যস্ত করেছে। উপরোক্ত সংজ্ঞা দুটোকে সামনে রাখলে আমরা দেখতে পাব যে শরিয়তের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সব বিষয় যেমন আক্বিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, আখলাক-সুলুক ও মুআমালাত—ফরজ হোক বা হারাম, মোস্তাহাব কিংবা মাকরূহ—সবই উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে যা ভাল ও কল্যাণকর তা মারূফের অন্তর্ভুক্ত আর যা খারাপ ও অকল্যাণকর মুনকারের অন্তর্ভুক্ত।

আমার বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব। এ মর্মে অনেক আয়াত ও অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এটি ওয়াজিবে কেফায়া। উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ অংশ এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের থেকে এটা না করার গুনাহ রহিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران:١٠٤)

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা সৎকাজের প্রতি আহ্বান করবে, নির্দেশ করবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম।'[১]

আয়াতে (ولتكن) শব্দটি أمر তথা নির্দেশ সূচক বাক্য। যা আবশ্যকীয়তাকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُّ إِنَّ اللهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة:٧١)

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[২] আর মুনাফেক সম্পর্কে বলেছেন :—

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. (التوبة: ٦٧)

'মুনাফেক পুরুষ, মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। অসৎকর্মের আদেশ করে এবং সৎকর্ম নিষেধ করে।[৩]

আল্লাহ তাআলা আমর বিল মারূফ এবং নাহি আনিল মুনকারকে (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ) মোমিন ও মুনাফেকদের সাথে পার্থক্যকারী নিদর্শন হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবি আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:—

১ সূরা : আলে ইমরান:১০৪

২ সূরা : তাওবা :৭১

৩ সূরা : তাওবা : ৬৭

سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

'আমি রসুল সা.-কে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ অন্যায় অশ্লীল কর্ম দেখলে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি সমর্থ না হও তাহলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে এতেও সমর্থ না হলে মন থেকে ঘৃণা করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচে দুর্বল ঈমান।'[১]

হাদিসে বর্ণিত فليغيره শব্দটি নির্দেশ সূচক বাক্য যা আবশ্যকীয়তার দাবিদার।

ইজমা প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম নববী রহ. বলেন:—

وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع.

'আমার বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে, কোরআন, সুন্নাহ, এবং ইজমা অভিন্ন মত পোষণ করেছে।'[২] বাকি থাকল ওয়াজিবে কেফায়া হওয়া। এটিও জমহুরে উম্মতের মতামতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনুল আরাবী মালেকি রহ. আল্লাহর বাণী ولتكن منكم أمة প্রসঙ্গে বলেনঃ আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার যে ফরযে কেফায়া তার প্রমাণ এ আয়াতের মধ্যেই বিদ্যমান।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের তিনটি তাৎপর্য :—

(এক) সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহর বিধানের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে মানুষ বলতে না পারে এটা যে, আল্লাহর অভিপ্রায় তা আমরা জানতে পারি নাই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :—

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ . النساء:١٦٥)

'সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ আরোপ করার মত অবকাশ না থাকে।'[৩]

---

[১] মুসলিম

[২]

[৩] সূরা নিসা : ১৬৫

(দুই) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণকারী (আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার) এর দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া। যেমন শনিবারের ব্যাপারে বাড়া-বাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের ভাল ও সৎ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :—

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (الأعراف:١٦٤)

‘আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা শাস্তি দিতে চান কঠোর শাস্তি ? তারা বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য।[১]

(তিন) যাকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া হয় বা অসৎ কাজ থেকে বারণ করা হয় তার উপকারের প্রত্যাশা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ . (الذاريات:٥٥)

‘আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কারণ উপদেশ মোমিনদের উপকারে আসবে।’[২]

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের তৎপর্য:—

আমর বিল মারূফ এবং নাহি আনিল মুনকার ইসলামের একটি অত্যবশ্যকীয় দায়িত্ব। একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এ ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য, সংস্কার ও সংশোধনের বিশাল মাধ্যম। তার মাধ্যমে সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা ও বাতিল পরাভূত হয়। তার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির বিস্তার ঘটে। কল্যাণ ও ঈমান বিস্তৃতি লাভ করে। যিনি আন্তরিকতা ও সততার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ পারিতোষিক।

কোরআনে অসংখ্য আয়াত ও প্রিয় নবীর অগণিত হাদিস এর প্রমাণ বহন করে। এর কতিপয় উদৃতি নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) আল্লাহ তাআলা বলেন:—

---

১ সূরা আ'রাফ : ১৬৪

২ সূরা যারিয়াত : ৫৫

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة:٧١)

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক-সুহৃদ। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, জাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ রহম ও দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাময়।'[১]

আয়াতে পরিষ্কার দেখা গেল যে আল্লাহ তাআলা আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের উপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(২) মহান রাব্বুল আলামীন আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনকারীদের প্রশংসা এবং তাদের পরিণাম ও শেষ ফল কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :—

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران:١٠٤)

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই সফলকাম।'[২]

(৩) আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আল্লাহ বলেছেন :—

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . (الأعراف:١٦٥)

'যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়ে গেল। তখন আমি সে সব লোকদের মুক্তি দান করালাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর

১ সূরা : তাওবা : ৭১

২ সূরা : আলে ইমরান : ১০৪

পাকড়াও করলাম গুনাহ্গার জালিমদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানির ফলস্বরূপ।[১]

(৪) আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, গজব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই দুনিয়া ও পরকালে কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. (المائدة:٧٨-٧٩)

'বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা করত। তারা যা করত অবশ্যই মন্দ ছিল।'[২]

মন্দ কাজে বাধা প্রদান ওয়াজিব হওয়া শর্তাবলী:—

প্রথমত : আদেশদান ও বাধা প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি:—

(১) ঈমান। অমুসলিমদের উপর এ দায়িত্ব ওয়াজিব নয়।

(২) মুকাল্লাফ বা শরিয়ত কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারীকে বুদ্ধিমান (عاقل) ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। নির্বোধ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর আদেশ ও নিষেধ করা ওয়াজিব নয়।

(৩) সামর্থ্য। যিনি এ কাজে ক্ষমতা রাখেন তার উপরই ওয়াজিব। আর যার ক্ষমতা নেই, অক্ষম ও অসমর্থ তার উপর ওয়াজিব নয়। তবে তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে ও অপছন্দ করতে হবে। করা আবশ্যকও বটে।

দ্বিতীয়ত: অসৎ কাজ (যা প্রতিহত করা হবে তার সাথে) সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি।

(১) কাজটি মন্দ ও নিষিদ্ধ এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ধারণা ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বাধা প্রদান বা প্রতিহত করণ জায়েজ হবে না।

(২) যে মন্দ কাজ প্রতিহত করবে সে যেন মন্দ কাজটি সম্পাদনকারীসহ প্রতিহত করার সময় কাজে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যেতে হবে।

---

১ সূরা : আরাফ : ১৬৫

২ সূরা : মায়েদা : ৭৮-৭৯

(৩) প্রতিরোধ উদ্দিষ্ট অসৎকর্মটি স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হতে হবে। অনুমান নির্ভর হলে প্রতিহত করণ জায়েজ হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন:—

وَلَا تَجَسَّسُوا. (الحجرات: ١٢)

'তোমরা দোষ ও গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।'[১]

তাছাড়া ঘর ও এ জাতীয় (সংরক্ষিত) জিনিসের একটি স্বকীয় মর্যাদা আছে। শরয়ি কোন কার্যকারণ ব্যতীত সেটি বিনষ্ট কর বৈধ হবে না।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদনকারীর কিছু আদব : —

ইখলাস ও আন্তরিকতা। কারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রধান একটি অন্যতম শীর্ষ ইবাদত ; আর ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:—

فَاعْبُدِ اللهَّ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. (الزمر:٢)

'অতএব আপনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন।'[২]

(২) ইলম তথা প্রয়োজনীয় জ্ঞান। ইলম ব্যতীত অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতে যাবে না। কারণ এতে শরীয়ত-নিষিদ্ধ কাজসমূহে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهَّ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي . يوسف ١٠٨

'বলে দিন, এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে সজ্ঞানে আহ্বান করি—আমি এবং আমার অনুসারীরা।'[৩]

(৩) আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে হক স্পষ্ট করার পাশাপাশি হিকমত ও সুকৌশল, সদুপদেশ এবং সূক্ষ্ম পন্থার সাহায্য নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. (النحل:١٢٥)

'আপনি মানুষদের আপনার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন।'[৪]

১ সূরা : হুজুরাত : ১৩

২ সূরা : ঝুমর : ২

৩ সূরা : ইউসুফ : ১০৮

৪ সূরা : নাহল - ১২৫

আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন আ.-কে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার কৌশল শিক্ষা দিয়ে বলেছেন :—

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. (طه:٤٤)

'অত:পর তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, এতে করে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।'[১]

আমাদের নবী মুহম্মদ সা.-কে লক্ষ্য করে বলেন :—

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. (آل عمران:١٥٩)

'আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।'[২]

(৪) আমর বিল মারূফ ও নাহি আমিল মুনকার-এর ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি বিষয় হচ্ছে : সবর ধৈর্য এবং সহনশীলতা।

লোকমান আ. স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন :—

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. (لقمان:١٧)

'হে বৎস ! সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও। মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর, এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।'[৩]

(৫) কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ তখনই করবে যখন অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের দিকটি প্রবল থাকে আর যদি অবস্থা বিপরীত হয় যে এটি করতে গেলে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনাই বেশি তাহলে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার জায়েজ হবে না। কারণ এতে অপেক্ষাকৃত ছোট মুনকার দূর করতে গিয়ে আরো বড় মুনকারে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

(৬) মুনকার ও অসৎকাজ দূর করার ক্ষেত্রে সবচে সহজ কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা। সুতরাং, সংগতিপূর্ণ পন্থা ও মাধ্যম বাদ দিয়ে আরো বড় মাধ্যম গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

---

[১] সূরা ত্বাহা : ৪৪

২ সূরা : আল ইমরান - ১৫৯

৩ সূরা : লোকমান - ১৭

(৭) আবু সাইদ খুদরী রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিন্যাস অনুযায়ী ধারাবাহিকতা ও স্তর বিবেচনায় রেখে মন্দ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া। আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন.

سمعت رسول الله– صلى الله عليه وسلم– يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان.

আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে (শক্তি প্রয়োগ করে) প্রতিহত করবে, সম্ভব না হলে (মুখের মাধ্যমে) প্রতিবাদ করবে। এও সম্ভব না হলে (মনে মনে) ঘৃণা করবে। আর এটি হচ্ছে ঈমানের সর্ব নিম্ন স্তর।’[১]

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সহজ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ সম্ভব হলে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। বরং এটি ঠিকও হবে না। যেমন, যে মন্দ কাজ প্রতিবাদের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। এ নীতিমালা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের উপকারিতা:—

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানে অনেক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) মন্দ ও অন্যায় দেখে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার পদক্ষেপ না নেয়া শাস্তি যোগ্য অপরাধ। কোরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী এসেছে। সুতরাং আমার বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর সে শাস্তি হতে দূরে থাকা যায় ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(২) আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার উৎসাহ—বরং নির্দেশ দিয়েছেন। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে উক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন হয় এবং কল্যাণ ও নেকের কাজে সহযোগিতা হয়।

(৩) সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ এর মাধ্যমে যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট বিদূরিত হয়। ফলে মানুষ স্বীয় দ্বীন-জান-সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ করে।

[১] মুসলিম

(৪) এর মাধ্যমে অন্যায় ও অনিষ্টের হার হ্রাস পায়। সমাজ থেকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেগুলো মূলত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করত। ফলে সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা, মিল-মহব্বত ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিবৃন্দ

সাহাবা, সাহাবির বহু বচন। সাহাবি বলতে সে সকল পুণ্যাত্মা মুসলমানদের বলা হয় যারা নবী আকরাম সা.-কে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন :

هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণে তাদের সম্পর্কে যে বিশ্বাস ও আক্বিদা পোষণ করা ওয়াজিব তা হচ্ছে—তারা উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান। উম্মতের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে কেউ তাদের সমান হতে পারবে না। তাদের যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। ঐ যুগের মর্যাদা সকল যুগ অপেক্ষা বেশি। এর কারণ হল, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন সবার আগে, এ দিকটির বিবেচনায় তারা পরবর্তীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

তারা আল্লাহর রাসূল, নবী-শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ সা. এর সোহবত-সাহচর্য ও শিষ্যত্বের জন্য বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তার সাথে মিলে জেহাদ করেছেন। তার পক্ষ থেকে শরিয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবতীদের নিকট তাবলীগ ও প্রচার করেছেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে তাদের প্রশংসা করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :—

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

(التوبة:١٠٠)

'মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত নির্ঝরিণীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি মহা সাফল্য।[১]

১ সূরা : তাওবা -১০০

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করেছেন। এবং তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন যে তারা কল্যাণ ও নেকির ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং নেয়ামতের আধার জান্নাত তাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾.

(الفتح:٢٩)

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরবৃন্দ কাফেরদের প্রতি কঠোর। নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন। তাদের চেহারায় রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই। আর ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা হচ্ছে এরকমই। যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। অত:পর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে—যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে প্রশংসা করেছেন যে, তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও নির্মম। তারা অধিক রুকু সেজদা কারী এবং আত্ম সংশোধনে অধিক তৎপর। তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের বিশেষ নিদর্শনের মাধ্যমে চেনা যায়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীর সাহচর্য গ্রহণের জন্য তাদের নির্বাচন করেছেন, যাতে তাদের দ্বারা তার দুশমন কাফেরদের অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

১ সূরা : ফাতহ-২৯

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾. (الحشر:٨-٩)

'এই সম্পদ দেশত্যাগী নি:স্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তারাই সত্যবাদী। এবং যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই মদিনায় বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না ; এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।'[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের অন্বেষণ এবং তার দ্বীনের সাহায্যার্থে নিজেদের বসত-ভিটা, ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন এবং এ বিষয়ে তারা সত্যবাদী, আর আনসারদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা পূর্ব হতেই দারুল হিজরত মদিনায় বসবাসকারী, নির্ভেজাল খাঁটি ঈমানদার ও প্রশস্তমন সম্পন্ন সাহায্যকারী। তাদের আরো গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, তারা স্বীয় দ্বীনি ভাই মুহাজিরদের নি:স্বার্থ ভাবে ভালবাসে, নিজেদের চাহিদার উপর তাদের চাহিদা প্রাধান্য দেয়। সর্বাবস্থায় তাদের সমবেদনা ও সহযোগিতা মনে লালন করে। তারা মানসিক কার্পণ্য মুক্ত। আর এ গুনের মাধ্যমেই তারা সফলতা অর্জন করেছে।

এগুলো তাদের সাধারণ মর্যাদার অংশ বিশেষ। এ ধরনের মর্যাদায় সকলেই অন্তর্ভুক্ত। তাদের বেলায় কিছু বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেণি বিন্যাস রয়েছে ; সেক্ষেত্রে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতর। আর এ স্তর বিন্যাস ও মর্যাদার তারতম্যের মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ, জেহাদ ও হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা : যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি তার পরে গ্রহণকারীর তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন:—

---

১ সূরা : হাশর-৮-৯

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد من هم ولا نتبرأ من أحد منهم و نبغض من يبغضهم و بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان.

'আমরা রাসূল সা. এর সকল সাহাবিদের ভালবাসি। তাদের কারো ভালোবাসার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়ি করি না আবার শৈথিল্য ও অবহেলাও করি না। যারা তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে, সমালোচনা করে, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি না। ভাল ভিন্ন তাদের আলোচনা করি না। তাদের ভালোবাসা ও মুহব্বত করা হচ্ছে—দ্বীন, ঈমান এবং এহসান, আর তাদের ঘৃণা করা-অপসন্দ করা হচ্ছে, কুফর, নিফাক ও সীমা লঙ্ঘন।'

সাহাবাদের মর্যাদার শ্রেণি বিন্যাস:—

সামগ্রিক বিচারে সাহাবারা সকলে অন্য সকল উম্মত অপেক্ষা উত্তম। তবে সাহাবারা নিজেরা কিন্তু সকলে একই স্তরের নন। বরং কেউ কেউ মর্যাদায় অন্যদের চেয়ে উত্তম। তাদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-বিন্যাস ও স্তর রয়েছে। নিম্নে তাদের মর্যাদার ক্রমধারা প্রদত্ত হল। সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চার খলিফা। অর্থাৎ আবু বকর অত:পর ওমর এর পর উসমান এবং তার পর আলী রাদিআল্লা আনহুম এদের পরবর্তী স্তরে আছেন অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশ্‌শারা (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবি) তথা—তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, সাইদ বিন যায়দ রাদি:। মুহাজির সাহাবাবৃন্দ আনসারদের চেয়ে উত্তম। বদর যুদ্ধে ও বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের চেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম। অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:—

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . (الحديد:١٠)

'তোমাদের কি হল ? তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় কর না ? অথচ আকাশমন্ডলি ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ তাআলা উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।'[১]

সাহাবাদের সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হচ্ছে : তাদের ব্যাপারে উম্মতের অন্তর এবং জিহ্বা (বাক শক্তি) সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে তাদের মানষিকতা সম্পর্কে বলেন :—

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . (حشر:١٠)

'এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে ক্ষমা কর। এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রতিপালক ! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।'[২] এ ব্যাপারে রাসূলের নির্দেশ ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :—

ولاتسبوا أصحابي فلو أن أدحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم مد أحدهم و لا نصيفه.

'তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিওনা। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে খরচ করে সেটি তাদের খরচকৃত এক মুদ বা তার অর্ধেকেরও সমানও হবে না।' (সওয়াবের দিক থেকে)।

যারা সাহাবাদের গালি দেয়, মন্দ বলে, সমালোচনা করে, তাদের ঘৃণা করে, তাদের মর্যাদা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশকে কাফের বলে মন্তব্য করে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত তাদের থেকে মুক্ত। কোরআন মাজীদ ও সহীহ হাদিসসমূহে সাহাবিদের যে সকল গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত সে সব গুলোকে গ্রহণ করে, তারা বিশ্বাস করে যে সাহাবারা

১ সূরা : হাদীদ-১০

২ সূরা : হাশর-১০

রাসূল ও নবীদের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাদের যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। ইমরান বিন হোসাইন রা. বর্ণিত রাসূল সা.-এর বক্তব্যও সেটি প্রমাণ করে। তিনি বলেন :—

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

'আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অত:পর যারা তাদের পরে এসেছে, এর পর যারা তাদের পরে এসেছে।' অর্থাৎ সাহাবারা হচ্ছেন উম্মতের মধ্যে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এর পর তাবেয়ীনরা এর পর তাবে তাবেয়ীনরা। ইমরান বলেন: নবী সা. পরে দুই যুগ বলেছেন না তিন যুগ বলেছেন এটি আমার জানা নেই। ইমাম আবু যুর আল রাযী বলেন:—তুমি কাউকে যে কোন একজন সাহাবির ব্যাপারে মর্যাদা হানিকর কিছু বলতে বা করতে দেখলে বিশ্বাস করবে যে এ লোক নাস্তিক ও অবিশ্বাসী ; মুসলমান নয়। কারণ বিভিন্ন অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে কোরআন হক, রাসূল হক, তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোও হক, আর এ সকল বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম। এখন যারা পবিত্রাত্মা সাহাবাদের সম্পর্কে মর্যাদাহানীকর মন্তব্য করে তাদের মর্যাদা ও আস্থাশীলতাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য কোরআন সুন্নাহকে ধ্বংস ও আস্থাহীন করা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাহলে এসব লোকদের সমালোচনা করা, নাস্তিক ও পথভ্রষ্টতার রায় দেয়া খুবই সংগত এবং ইনসাফ প্রসূত।

আল্লামা ইবনে হামদান বলেন :— যে ব্যক্তি একজন সাহাবিকেও মন্দ বলা বৈধ মনে করে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। আর বৈধ মনে না করে বললে ফাসেক বলে সাব্যস্ত হবে। আর অন্য একমত অনুযায়ী উভয় অবস্থাতেই কাফের বলে বিবেচিত হবে। যারা সাহাবাদেরকে ফাসেক বলবে অথবা তাদের দ্বীনদারী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে অপবাদ দেবে অথবা কাউকে কাফের বলে মন্তব্য করবে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে। মর্যাদা ও ফজিলতের দিক থেকে সাহাবিদের পরবর্তী স্তরে রয়েছেন হেদায়াতের রাহবার তাবেয়ীনবৃন্দ এবং মর্যাদা প্রাপ্ত তিন যুগের তাদের অনুসারীরা। এর পর তাদের পরে আগত নিষ্ঠার সাথে সাহাবাদের অনুসরণ কারীরা...যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :—

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. (التوبة:١٠٠)

'মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট।'[১]

অতএব তাদের ব্যাপারেও মন্দ বলা যাবে না। মানহানীকর কিছু করা যাবে না তাদের সম্মান হ্রাস পায় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা তারা হচ্ছেন أعلام الهدى হেদায়াতের নিদর্শন। এরশাদ হচ্ছে—

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . (النساء:١١٥)

'কারো নিকট সৎপথ ও হেদায়াতের রাস্তা প্রকাশ হওয়ার পর যদি সে রাসূল-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মোমিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে। এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[২]

আল্লামা ইবনে আবিল ইয হানাফী রহ. বলেন:—প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধুত্বের পর মোমিনের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা ওয়াজিব। কোরআন এ নির্দেশই দিয়েছে। বিশেষ করে যারা নবীদের ওয়ারিস ও উত্তরসুরী, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নক্ষত্র সদৃশ করে বানিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে জলস্থলের অন্ধকার ও গোমরাহি থেকে পরিত্রাণের দিশা পাওয়া যায় ; সকল মুসলমান তাদের হেদায়াত ও জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারে একমত। আমাদের উপর তাদের দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে ; কারণ তারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগামী এবং রাসূল সা. যে শরিয়ত ও দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, সে গুলো তারাই আমাদের নিকট প্রকাশ ও স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন হন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . (الحشر:١٠)

১ সূরা : তাওবা-১০০

২ সূরা : নিসা-১১৫

'হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে ক্ষমা করে দিন। মোমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তো দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু ।'[১]

তারা উম্মতের জন্য রাসূলের প্রতিনিধি। রাসূলের নির্জীব ও বিলুপ্ত আদর্শকে তারাই জীবন্ত করেছেন। তাদের মাধ্যমে কোরআন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তারা কোরআন-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কোরআন তাদের সম্পর্কে বলেছে এবং তারাও কোরআনের কথা বলেছেন। তারা সকলেই রাসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে নি:সংশয়ভাবে একমত।

তবে তাদের কারো পক্ষ থেকে যদি এমন কোন মত পাওয়া যায়, যার বিপরীত সহীহ হাদিস বিদ্যমান, তাহলে এ হাদিস পরিত্যাগ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন ওজর আছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের ওজর তিন ধরনের :—

(এক) নবী কারীম সা. এ কথা বলেছেন—মর্মে বিশ্বাস না থাকা।

(দুই) ঐ মন্তব্য দ্বারা তিনি সেই মাসআলাই বুঝিয়েছেন—এ বিশ্বাস না করা।

(তিন) হুকুমটি মানসুক (রহিত) মর্মে বিশ্বাস করা।

ওলামাদের কারো কারো থেকে ইজতিহাদ জনিত ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা হ্রাস করা তো বেদআতিদের পন্থা। এবং মুসলমানদের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের অংশ-বিশেষ, যারা বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে করে আসছে। যেমন—যে কোন উপায়ে দ্বীন ইসলামে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া, মুসলমানদের নিজেদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়া, উম্মতের পরবর্তীদেরকে পূর্ববর্তীদের মত ও পথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দেয়া। ওলামা ও সর্বসাধারণের মাঝে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া—যা কখনো কখনো হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমান যুগের কতিপয় তালেবে ইলম, যারা ফিকহে ইসলামি এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ফোকাহাদের মান মর্যাদা হ্রাস করনে সদা তৎপর যার কারণে তা অধ্যয়ন ও এতে বর্ণিত হক গ্রহণ করে উপকৃত হওয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও বিমুখ, তাদের সতর্ক হয়ে এ পথ থেকে ফিরে আসা উচিত। স্বীয় ফেকহ নিয়ে গর্ববোধ এবং ফেকহবিদদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া উচিত। ধ্বংসাত্মক ও বিভ্রান্ত কারী প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দিন।

---

১ সূরা : হাশর - ১০

বেদআত

বেদআতের সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থে বেদআত البدع থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ হচ্ছে,

الاختراع على غير مثال سابق.

অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন আবিষ্কার।
এ থেকেই আল্লাহ তাআলার বাণী :

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. البقرة:(١١٧)

অর্থাৎ 'অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত আকাশ জমিনের সৃষ্টিকর্তা।'[১] এবং

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف:٩)

অর্থাৎ 'আমিই প্রথম ব্যক্তি নই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট রিসালতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।'[২] বরং আমার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন। প্রচলন আছে : ابتدع فلان بدعة অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শুরু করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। শরয়ি পরিভাষায় বেদআত বলা হয়—

ما أحدث في الدين على خلاف ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل.

'দ্বীনের মধ্যে রাসূল সা. ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো।'

আবিস্কার দুই প্রকার :

১ সূরা : বাকারা-১১৭

২ সূরা: আহকাফ

(১) অভ্যাস (ও জাগতিক প্রয়োজনের) ক্ষেত্রে আবিষ্কার—যথা বর্তমানে প্রচলিত ও নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ। এগুলো মুবাহ (অনুমোদিত)। কারণ আদত ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে ইবাহাহ الإباحة বা বৈধ হওয়া।

(২) দ্বীনের (ইসলাম ধর্মের) ক্ষেত্রে আবিষ্কার। এটি হারাম। কারণ দ্বীনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে توقيف বা শরিয়তের সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:—

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

'যে আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই সেটি পরিত্যাজ্য।'

এ হাদিস প্রমাণ করছে যে, দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বেদআত আর প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি ও পরিত্যাজ্য। এর অর্থ হচ্ছে ইবাদত ও আক্বিদার ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার, যার নজির পূর্বে নেই—হারাম ও অবৈধ। তবে এ অবৈধতার প্রকৃতি ও ধরন বেদআতের ধরন অনুপাতে বিভিন্ন রূপের হয়। কিছু বিষয় আছে যা সরাসরি কুফুরী যেমন কবরবাসীদের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কবর তাওয়াফ করা, কবরের উদ্দেশ্যে জবেহ করা, মান্নত প্রেরণ করা, কবরবাসীর নিকট দোয়া করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, এমনি ভাবে গোড়া মু'তাযিলা ও জহমীদের আক্বিদা ও মাজহাব।

আবার কিছু বিষয় আছে যা শিরকের মাধ্যম। যেমন কবরের উপর সৌধ বা এ জাতীয় কিছু নির্মাণ করা কবরের নিকট সালাত আদায় করা, দোয়া করা—ইত্যাদি। কিছু বিষয় আছে যা ফিসকে ইতেকাদী বা বিশ্বাসগত ফিসক। যেমন কবিরা গোনাহে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কাফের বলে রায় দেয়া বা কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফরি জ্ঞান করা। আমলকে ঈমানের সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কার করা অর্থাৎ আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে না করা। আবার কিছু কিছু বেদআত আছে যা শুধুমাত্র গোনাহ ও নাফরমানি—যেমন বিবাহ শাদি পরিত্যাগ করা। রোদে দাঁড়িয়ে সিয়াম পালন করা।

দ্বীনের ভিতর বেদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বীনের ভিতর সকল বেদআতই হারাম। যারা বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ বলে বিভক্ত করে,

তারা ভুল করে থাকেন। এবং রাসূল সা.-এর বাণী—فإن كل بدعة ضلالة নিশ্চয়ই প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি—এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. বেদআত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি আর এরা বলছে, না প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি নয় বরং কিছু বেদআত আছে হাসানাহ (ভাল)।

আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেন : নবী আকরাম সা.-এর বাণী كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি) একটি جوامع الكلم তথা ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য। আল্লাহর রাসূল বলেন :.من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد (যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে)—সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ক্ষেত্রে সকল বিষয়—যথা আকায়েদ, আমল জাহেরী ও বাতেনী আকওয়াল—সব সমান।

এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডন :—

সাহাবি ওমর রা. একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন : نعمت البدعة هذه (কত না সুন্দর বেদআত এটি) বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই।

তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদিস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল সা. নিজে করে যাননি।

উত্তর :—আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বেদআত নয় বরং শরিয়তের এগুলোর একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর রা. এর বক্তব্য نعمت البدعة তে শরয়ি بدعة নয়। সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ি ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন بدعة বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বেদআত বুঝতে হবে—শরয়ি নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই সাহাবিদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর রা. সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বেদআত ছিল না। এখনও নয়। আর এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করাও শরিয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন।

হাদিস লিপিবদ্ধ করারও একটি শরয়ি ভিত্তি আছে। রাসূল সা. কতিপয় সাহাবিকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদিস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে গায়রে কোরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হাদিস সংকলনে হাত দেন। এবং সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ তারা স্বীয় প্রতিপালকের কিতাব এবং নিজ নবীর সুন্নাহ বৃথা যাওয়া ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে ইলম ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট সাধারণ বেদআতের প্রচলন উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগে শুরু হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدين المهديين.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু এখতেলাফ মতানৈক্য দেখতে পাবে। সেসময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত, হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরা।'[১] সাহাবায়ে কেরাম সে সকল আহলে বেদআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বেদআত উৎপত্তির কতিপয় কারণ :

বেদআত ও গোমরাহিতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . (سورة الأنعام:١٥٣)

'এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ কর না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[২]

সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন :

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن نمينه و عن شماله ثم قال : و هذه سبل_قال يزيد متفرقة_ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه.

'রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের (দেখানোর) জন্য একটি রেখা টানলেন বা দাগ দিলেন অত:পর বললেন এটি আল্লাহর পথ। এর পর এ রেখার ডানে বামে আরো অনেকগুলো দাগ দিলেন এর পর বললেন : এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ। ইয়াযীদ নামক হাদিসের জনৈক বর্ণনাকারী বললেন বিচ্ছিন্নকারী (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্নকারী বিভিন্ন পথ) এরপর প্রত্যেকটি পথের উপর একটি করে শয়তান বসে আছে, সে পথের দিকে আহ্বান করে। অত:পর পড়েছেন:—

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . (الأنعام:١٥٣)

১

২ সূরা : আল আনআম - ১৫৩

'এটিই আমার সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[১]

অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, এড়িয়ে চলবে, বিভ্রান্ত কারী রাস্তা এবং নব আবিষ্কৃত বেদআতসমূহ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবে। বেদআত উৎপত্তির গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলোতে সংক্ষেপণ করা যায়:—

(১) দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা :

রাসূলের যুগ থেকে সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং মানুষ রিসালাতের প্রভাব ও নিদর্শন থেকে দূরে সরে চলেছে ততই ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান কমে চলেছে এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছে ও সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। বরং এ প্রসঙ্গে নবী সা. নিজেই বলেছেন—

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।' তিনি আরও বলেন:—

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا.

'আল্লাহ তাআলা ইলম বান্দাদের থেকে উপড়ে নেয়ার মত করে উঠিয়ে নিবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে।'[২] বেদআতকে একমাত্র ইলম ও ওলামারাই প্রতিরোধ করতে পারেন এবং করেও থাকেন। যখন এতদুভয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন বেদআত প্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ পেয়ে যায়, আর বেদআতপন্থীরা এ বিষয়ে নব উদ্যম খুঁজে পায় এবং কাজ করতে শুরু করে।

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণ:—

১ সূরা : আল আনআম - ১৫৩

২

মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন—

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . (القصص:٥٠)

'অত:পর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।'[১] আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . (الجاثية:٢٣)

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পরদা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না ?'[২]

বেদআত অনুসৃত প্রবৃত্তির বুনন বৈ নয়।

(৩) ব্যক্তি ও মতের পক্ষাবলম্বন:—

সত্যাসত্য যাচাই না করে কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মতের পক্ষাবলম্বন করা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে সঠিক দলিলের অনুসরণ ও হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। ব্যক্তি ও দলিলের আনুগত্যের মাঝে সেই পক্ষাবলম্বন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ . (البقرة:١٧٠)

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে হুকুমের অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না বরং আমরা তো সে

১ সূরা : কাসাস-৫০

২ সূরা : জাছিয়া-২৩

বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না: জানতো না সঠিক পথও।'[১]

বর্তমান যুগেও এ প্রকৃতির অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী কবর পূজারি। আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা যে মতাবলম্বী এবং যে ব্যক্তির দর্শন গ্রহণ করেছে যদি সে মত ও দর্শনের বিপরীত কোরআন ও হাদিসের সঠিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাদের বলা হয়, আপনি যে মত ও দর্শন গ্রহণ করেছেন সেগুলো তো কোরআনের এ আয়াত ও এ সকল হাদিস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং উক্ত মত ও পথ ছাড়ুন এবং কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সঠিক পথে ফিরে আসুন। তখন তারা নিজ মাজহাব মাশায়েখ ও বাপ-দাদার মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলে যে, এতকাল যাবৎ তারা কি ভুল করে এসেছে ? যুগ যুগ ধরেই তো এ আমল চলে আসছে। কই কেউ তো ভুল বলেনি ? আমাদের পীর-বযুর্গরা এত বড় আলেম, তারা কি ভুল করতে পারে?—ইত্যাদি যতসব অসার ও বাতিল কথা বলে হককে এড়িয়ে যায়।

(৪) বিধর্মী কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বন:—

বেদআত ও কুপ্রথায় পতিত করার ব্যাপারে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন একটি বিরাট কারণ, যেমন আবু ওয়াক্বিদ লায়সী রা. এর হাদিসে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হোনাইন অভিমুখে যাত্রা করলাম। সে সময় সবে মাত্র কিছুদিন হলো আমরা কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, এদিকে 'যাতে আনওয়াত' নামে মুশরিকদের একটি বড়ই বৃক্ষ ছিল, যার চার পাশে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র সে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। পথিমধ্যে আমরা সে গাছের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের যেমন 'যাতে আনওয়াত' আছে আপনি আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' স্থির করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহু আকবার إنها السنن এটি একটি রীতি, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমরা তেমন একটি কথাই কললে যেমনটি বলেছিল, বনী ইসরাইলরা নবী সা. মূসা আ. কে—

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. (الأعراف:١٣٨)

১ সূরা : বাকারা-১৭০

তারা বলতে লাগল, হে মুসা আপনি আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন তোমরা নিতান্তই একটি অজ্ঞতা প্রসূত সম্প্রদায়।[১]

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বসূরিদের রীতি অনুসরণ করবে।[২]

এ হাদিস নবী আকরাম সা. সুস্পষ্টকরে বর্ণনা করছেন যে, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনই বনী ইসরাইলকে ইবাদতের জন্য মূর্তি নির্মাণ করে দেয়ার মত কদর্য অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর ঐ একই জিনিস রাসূলুল্লাহ সা. কতিপয় সাহাবিকে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছ নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করতে উৎসাহ করে তুলছিল। বর্তমান সময়েও এমনটি ঘটে চলেছে যে অধিকাংশ মুসলমান শিরকি ও বেদআতি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপন, নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সপ্তাহ বা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে নেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষ ও স্মরণিকা স্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ, ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণ। কবরের উপর ঘর-গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

বিদআতের ক্ষতিকর দিক:—

বেদআতের অভ্যুদয় ও ব্যাপ্তিতে নানাবিধ ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে অনেক মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। নিম্নে কিছু নমুনা পেশ করা হল।

(১) মহান আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনকে পূর্ণতা দিয়েছেন মর্মে ঘোষণা করে বলছেন

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة:٣)

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।'[৩]

বেদআত সংঘটিত করার মাধ্যমে আল্লাহর উপরোক্ত বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কারণ একজন বেদআতি যখন একটি নতুন বেদআত প্রচলন ঘটায় তখন

---

১ সূরা : আরাফ-১৩৮

২ তিরমিজি, হাদিসটি সহি

৩ সূরা : আল মায়েদা-৩

সে সেটিকে দ্বীন বলেই বিশ্বাস করে। আর এর অর্থই হচ্ছে, দ্বীন পূর্ব হতে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাতে সংযোজনের সুযোগ আছে।

(২) বেদআতের প্রচলন দ্বারা শরিয়তে ইসলামিয়া অসম্পূর্ণ ও ত্রুটি যুক্ত ছিল—প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। বেদআত প্রচলনকারী এর ত্রুটি দূর করে পূর্ণতা দান করেছেন মর্মে বিশ্বাস করাকে বাধ্য করে।

(৩) বেদআত—যে সকল মুসলমান তাকে গ্রহণ করেনি—তাদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়াকে আবশ্যক করে যে, তাদের দ্বীন অসম্পূর্ণ, সাথে সাথে যারা এ বেদআত আত্মপ্রকাশ করার পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের ধর্মও অপূর্ণ ছিল মর্মে বিশ্বাস করাকে জরুরি করে তুলে। অথচ এ ব্যাপারটি কত মারাত্মক।

(৪) বেদআত সুন্নত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কেননা সাধারণত: দেখা যায় যারা বেদআত লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা সুন্নত থেকে দূরে সরে যান। এ প্রসঙ্গে কতিপয় সালাফ থেকে বর্ণিত তারা বলেছেন :

ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة.

'যখনই কোন সম্প্রদায় বেদআতের প্রচলন ঘটায় তখন উক্ত বেদআতের কারণে সে স্থানের সুন্নতের বিলুপ্তি ঘটে।'[১]

(৫) বেদআত উম্মতের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করে তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে। কারণ বেদআতপন্থীরা বিশ্বাস করে যে তারা হকপন্থী আর যারা তাদের মত গ্রহণ করেনি তারা সকলে বাতেল ও গোমরাহ। পক্ষান্তরে হকপন্থীরা বলে থাকে, তোমরাই মূলত বাতেল এবং তোমরাই গোমরাহিতে লিপ্ত। এতে করে উভয় দলের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এবং অনৈক্য দেখা দেয়।

বেদআত পন্থীদের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনদের অবস্থান :—

সালাফে সালেহীনগণ সর্ব যুগে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেদআত পন্থীদের রদ করে এসেছেন এবং তাদের উদ্ভাবিত বেদআতকে অস্বীকার করে এর প্রচলনকে প্রতিরোধ প্রতিহত করে এসেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল।

(ক) উম্মে দারদা রা. বলেন: একবার আবু দারদা (তার স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, কি হয়েছে ? উত্তরে বললেন,

---

১

আল্লাহর কসম, আমি তাদের মাঝে মুহম্মদের রেখে যাওয়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে হ্যা, শুধু এতটুকু যে তারা সকলেই সালাত আদায় করে।

(খ) ওমর বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমি আমার পিতাকে তার বাবা থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর বাড়ির সামনে সমবেত হয়ে বসতাম। তিনি বের হলে আমরা তার সাথে মসজিদে যেতাম, একদিন আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী রা. এসে বললেন, আবু আব্দুর রহমান কি বের হয়ে গেছেন ? আমরা বললাম, না। (তিনি ভিতরেই আছেন) তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন, এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বের হয়ে আসলেন। তিনি আসলে আমরা সকলেই তার নিকট গেলাম। আবু মুসা আশআরী বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান আমি একটু আগে মসজিদে গিয়ে এমন একটি কাজ দেখলাম যা ইতিপূর্বে আর দেখিনি কাজটি আমার নিকট অপরিচিত মনে হল, তবে আলহামদু লিল্লাহ ! এতে আমি খারাপের কিছু দেখিনি। বরং ভালই মনে হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কাজটি কী ? আবু মুসা বললেন : বেঁচে থাকলে একটু পর আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। আমি দেখলাম কিছু লোক মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় গোল হয়ে হালকাবন্দী হয়ে বসে আছে, প্রত্যেক হালকায় একজন দায়িত্বশীল রয়েছে এবং সকলের হাতে কঙ্কর। দায়িত্বশীল বলছেন, আপনারা একশত বার তাকবীর বলুন, তারা একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করছে। তারপর বলছেন একশত বার তাহলীল পাঠ করুন তারা একশত বার লা ইলাহা বলছে, অত:পর বলছে একশত বার তাসবীহ পাঠ করুন, তারা একশত বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করছে। শুনে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বললেন, আপনি এ দেখে তাদের কি বললেন ? তিনি বললেন, আমি তাদের কিছুই বলিনি, আপনার নির্দেশ বা রায়ের অপেক্ষায় আছি। তখন তিনি বললেন, আপনি কেন তাদের স্বীয় পাপের হিসাব করার নির্দেশ দেননি এবং তাদের নেক কাজগুলো বিনষ্ট হবে না মর্মে জামানত গ্রহণ করেননি ? একথা বলে তিনি মসজিদ পানে চললেন। আমরাও তার সাথে সাথে গেলাম, মসজিদে পৌঁছে একটি হালকার নিকট গিয়ে বললেন—আমি এসব কি দেখছি ? আপনারা এসব কি করছেন ? তারা উত্তরে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, এ কঙ্করগুলো দিয়ে হিসাব করে করে আমরা তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ এবং তাহমীদ পাঠ করছি, তখন তিনি বললেন—আপনারা আনাদের পাপের হিসাব করুন, আপনাদের নেককাজ থেকে বিন্দুমাত্র কিছু নষ্ট হবে না—আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি, হে নবী

মুহম্মদের উম্মতবৃন্দ! আপনাদের একী হল? আপনার ধ্বংস অত্যাসন্ন, নবীজীর এ সাহাবাবৃন্দ তখনও আনাদের মাঝে বিদ্যমান, এটি তার ব্যবহৃত বস্ত্র, এখনও পুরাতন হয়নি, তার পানপাত্র সমগ্র এখনও ভেঙে যায়নি। শপথ সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, হয় তোমাদের এ ধর্ম, যা তোমরা পালন করছ, মুহাম্মদ সা. আনীত ধর্ম অপেক্ষা অধিক সঠিক অথবা তোমরা গোমরাহির দরজা উন্মুক্ত করছ। তখন তারা বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান আল্লাহর কসম আমরা একমাত্র কল্যাণ ও নেকের উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছি। তিনি বললেন, বহু কল্যাণ প্রত্যাশী আছে কিন্তু কল্যাণ তাদের পর্যন্ত পৌঁছোয় না। রাসূল সা. আমাদের বলেছেন, এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, তারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, আল্লাহর কসম কে জানে হয়তো তাদের অধিকাংশ তোমাদের মধ্য হতেই হবে, অত:পর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমর বিন সালামা বলেছেন : আমরা তাদের অধিকাংশ লোকদের দেখেছি যে তারা নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজিদের সাথে মিশে আমাদের আঘাত করছে।[১]

(গ) এক ব্যক্তি ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথা হতে হজের এহরাম বাঁধব ? তিনি বললেন : মীকাত থেকে, যেটি রাসূলুল্লাহ সা. নির্ধারণ করেছেন এবং নিজে এহরাম বেঁধেছেন। লোকটি বললেন, আমি যদি আরো দূর হতে এহরাম বাঁধি ? ইমাম মালেক বললেন, আমি এটি জায়েজ ও সংগত মনে করি না। আগন্তুক বললেন, আপনি এতে অপছন্দের কি দেখলেন ? তিনি বললেন : আমি আপনার উপর ফেতনাকে অপসন্দ করছি। লোকটি বললেন, নেক ও কল্যাণের কাজ বৃদ্ধি করাতে আবার ফেতনা কিসের ? ইমাম মালেক বললেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (النور:٦٣)

'অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে বিপর্যয় ও ফেতনা তাদের স্পর্শ করবে, অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস করে নিবে।'[২]

এর থেকে বড় ফেতনা আর কি হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ সা. যে ফজিলত নির্ধারণ করেনি তুমি তা নির্ধারণ করে নিচ্ছ বা করতে চাচ্ছ ?

(ঘ) সাইদ ইবনে মুসাইয়েব রহ. জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন ফজর উদিত হওয়ার পর সে দুই রাকাতের অতিরিক্ত নামাজ পড়ে এবং তাতে রুকু সেজদা বেশি

১

২ সূরা : নূর-৬৩

করে। তখন তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করলেন। সে বলল : হে আবু মুহাম্মদ, আল্লাহ তাআলা আমাকে নামাজ পড়ার কারণেও কি আজাব দেবেন ? সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বললেন : না, নামাজের কারণে নয়, আজাব দেবেন সুন্নত পরিপন্থী কাজ করার কারণে। এমনি করে ওলামায়ে ইসলাম সর্বযুগে বেদআত এবং বেদআত পন্থীদের প্রতিহত, প্রতিবাদ করে এসেছেন। আলহামদু লিল্লাহ!

বর্তমান যুগের সাথে রিসালতের যুগের দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, অপ্রতুলতা, বেদআত ও সুন্নত পরিপন্থী প্রচলনের আধিক্য ও এর প্রসারের ক্ষেত্রে বিশাল কর্মী বাহিনীর ব্যাপক কর্ম তৎপরতার এবং শিল্প-সংস্কৃতি, অভ্যাস আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাফের বিধর্মীদের সাদৃশ্যাবলম্বন ব্যাপক সংক্রমণসহ নানাবিধ কারণে বেদআতের সংখ্যা ও প্রচলন অনেক। এখানে আমরা কয়েকটি প্রচলিত বেদআত সম্পর্কে সামান্য আলোচন করব।

(১) ঈদে মিলাদুন্নবি সা. উদযাপন:—

খ্রিস্টান নাসারা নবী ঈসা আ.-এর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে হলি কৃস মাস পালন করে, তাদের দেখাদেখি কতক মুসলমানও একাজ শুরু করেছে, প্রত্যেক বৎসর রবিউল আউয়াল মাস আসলে রাসূল সা.-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে। তাদের কেউ কেউ এ অনুষ্ঠান মসজিদে করে থাকে। কেউ কেউ নিজ বাড়িতে, আবার কেউ এ উদ্দেশ্যে বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করে খুব জাঁক-জমকের সাথে উদযাপন করে। এসব অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণসহ সর্ব শ্রেণির মানুষ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে, এগুলো মূলত খ্রিস্টানদের কালচার-অনুকরণ, যা তারা ঈসা আ. এর জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে করে থাকে।

এসব অনুষ্ঠানাদি বেদআত ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যাবলম্বন। তাছাড়া ও বিভিন্ন শিরক, ও নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে মুক্ত নয় যেমন রাসূল সা.-এর শানে কবিতা ও গজল আবৃতি যেসব গজলে তার প্রশংসার নামে এমন সব কথা বার্তা বলা হয়, যেগুলো মূলত আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণেই এগুলো শিরক হয়ে যায়। কোন কোন গজলে গাইরুল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করা হয়—ইত্যাদি। অথচ নবী কারীম সা. তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন:—

لاتطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله.

'খ্রিস্টানরা-নাসারা মরিয়ম তনয় ঈসার ব্যাপারে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আমায় নিয়ে সে রূপ বাড়াবাড়ি করবে না, আমি একজন বান্দা বৈ অন্য কিছু নই। সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বলতে চাইলে এতটুকু বলবে, যে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল।'[১]

কখনো এমন বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূল সা. মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন।

মিলাদ মাহফিলে সংঘটিত শরিয়ত বিরোধী কিছু অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের নমুনা:—

সম্মিলিত কণ্ঠে সুর করে গানের আকৃতিতে ঢোল তবলা বাজিয়ে গজল পরিবেশন। একই পদ্ধতিতে সুফি-সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রবর্তিত বেদআতি জিকির আযকার।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যাতে শরয়ি পর্দার বিধান লঙ্ঘন হওয়ার পাশাপাশি নানারকম ফেতনার সৃষ্টি হয়। এ থেকে আবার মাঝে মধ্যে অশ্লীল-অশালীন কাজ ও সংঘটিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এছাড়াও আরো অনেক ধরনের শরয়িত বিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে। যদি উপরোক্ত অশালীন ও শরয়ি পরিপন্থী কোন কাজ নাও হয়, তাদের বক্তব্য মত শুধু মাত্র সমবেত হওয়া, খাবার বিতরণ ও আনন্দ ফুর্তি প্রকাশের মধেই সীমিত থাকে তারপরও তো এটি একটি নব আবিষ্কৃত বেদআত যার সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন:—

كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.

'প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত আমলই বেদআত, আর প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি এবং সকল গোমরাহির স্থান জাহান্নাম।'[২] তাছাড়া এটিতো এ পর্যন্তই সীমিত থাকে না, বরং জমায়েতই ক্রমান্বয়ে আরো উন্নত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এসে তাতেও সে সকল নিষিদ্ধ ও শরিয়ত পরিপন্থী কাজ কর্ম শুরু হবে যা অন্যান্য সমাবেশ গুলোতে হয়।

এবং ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে এ উপলক্ষে উদ্‌যাপিত সকল ক্রিয়াকর্মই বেদআত; কোরআন ও হাদিসে এর কোন ভিত্তি নেই। সালাফে সালেহীন ও স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রাপ্ত প্রথম তিন যুগের কেউ এ সকল কাজ করেছেন মর্মেও কোন প্রমাণ

---

[১] বোখারি ও মুসলিম

[২] ইবনে মাজা

নেই। বরং এটি সৃষ্টিই হয়েছে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর। বাতেনপন্থী উবায়দীরা, যারা নিজেদের ফাতেমী বলে দাবি করে এর প্রচলন শুরু করে।

ইমাম আল ফাকিহানী রহ. বলেন:—

আম্মা বাদ, কতিপয় লোক রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদের নাম করে যে সমাবেশ ইত্যাদি করে থাকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন থেকে আমার নিকট বার বার প্রশ্ন আসছে যে এরূপ আমলের কোন ভিত্তি শরীয়তে আছে কি না ? উত্তরে আমি আল্লাহর তাওফীক চেয়ে বলব: না, আমার জানা মতে এ মিলাদ মাহফিলের কোন ভিত্তি না কোরআনে আছে, না হাদিসে, এবং এ আমল নির্ভরযোগ্য আমাদের কোন পূর্বসূরিদের কেউ করেছেন মর্মেও কোথাও বর্ণিত হয়নি। বরং এটি নব আবিষ্কৃত বেদআত যার প্রবর্তন করেছে কিছু বাতেল লোক। এবং এটি একটি কুপ্রবৃত্তির চাহিদা প্রসূত কাজ যাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুটছে পেট পূজারিরা।[১]

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন :—

অনুরূপভাবে যা বর্তমানে কিছু লোক নতুন প্রবর্তন করেছে, হয়তো নবী ঈসা আ. এর জন্ম দিবস উপলক্ষে খ্রিস্টান নাসারাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের অনুকরণে অথবা নবী আকরাম সা. এর মহব্বতও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে...যেমন তার জন্ম দিবসকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করা, যদিও তার জন্ম দিবস সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (এ সবই বেদআত)। কেননা সালাফে সালেহীনদের কেউ এরূপ কিছুই করেননি। যদি এসকল কাজ কল্যাণকর ও ফজিলতপূর্ণ অথবা শুধুমাত্র বৈধ হত, তাহলে সালাফে সালেহীনরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আরম্ভরতার সাথে উদযাপন করতেন। কারণ তারা নবীর মুহাব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে ছিলেন। নিজেদের জীবনের চেয়ে রাসূল তাদের নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন এ কথার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছেন। রাসূলের জন্য তারা পরিবার পরিজন ও মাতৃভূমিসহ সবকিছু ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তা ছাড়া কল্যাণমূলক ও বৈধ কাজে তাদের আগ্রহ আমাদের চেয়ে বেশি ছিল। শরিয়ত সম্মত কাজে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। বরং নবীজীর প্রকৃত মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন, হারিয়ে যাওয়া সুন্নতের পূণজাগরণ, যে দ্বীন ও শরিয়ত নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তার প্রচার ও প্রসার, এবং এর জন্য মুখ, হাত, ও হৃদয় দিয়ে জেহাদ ইত্যাদি কাজে অবতীর্ণ হওয়া, ও

১

জান-তোড় মেহনত করাই প্রকৃত অর্থে তাকে ভালবাসা, মুহাব্বত ও ভালবাসার এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুগামী উম্মতের পূর্বসূরিরা, এটিই ছিল তাদের পথ ও পন্থা। সুতরাং কেউ যদি প্রকৃতই রাসূল সা.কে ভালোবাসতে চায়, সম্মান প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে তাকেও তাদের অনুসরণে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে হবে। জন্ম দিবস উদযাপন করে তার ভালোবাসার বহি:প্রকাশ করা হচ্ছে মূলত খ্রিস্টানদের অনুসরণ। যা সর্বতোভাবেই বেদআত ও জঘণ্য পাপ। মিলাদের এ বেদআতি প্রচলনকে খণ্ডন করে অনেক কিতাব ও পুস্তিকা পূর্বেই প্রণীত হয়েছে। বর্তমানেও হচ্ছে। এটি যে বেদআত ও কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বন তা তো প্রমাণিত সত্য। এ ছাড়াও নবীজীর জন্ম দিবস উদযাপন মূলত অন্য ওলী আউলিয়া ও পীর মাশায়েখদের জন্মদিবস উদযাপন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন পাপ কর্ম এবং বেদআতি কাজ সম্পাদনের রাস্তাকে খুলে দেয় ও প্রশস্ত করে।

(২) মৃত বা জীবিত ব্যক্তিবর্গ, পুণ্যভূমি ও নিদর্শন থেকো বরকত লাভ করা:—

নব প্রবর্তিত বেদআতের একটি হচ্ছে মাখলুক দ্বারা বরকত প্রার্থনা করা, এটি পৌত্তলিকতার একটি ধরন। এবং এমন একটি ফাঁদ যার মাধ্যমে মৌসুমি ও ভাড়াটে ইসলাম প্রেমিকরা সহজ সরল মুসলমানদের ধন-সম্পদ শিকার করে।

তাবাররুক দ্বারা (التبرك) উদ্দেশ্য হচ্ছে, বরকত প্রার্থনা করা অর্থাৎ কোন বস্তুতে মঙ্গল ও কল্যাণ ছাবেত এবং বেশি হওয়া।

কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করার প্রার্থনা একমাত্র তার নিকটই করা হয় যিনি কল্যাণের মালিক এবং বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনিই বরকত অবতীর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। মাখলুক (সৃষ্টি-জীব) না বরকত দেয়ার ক্ষমতা রাখে, না সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, সে বরকত ধরেও রাখতে পারে না। আবার প্রতিষ্ঠিত ও করতে পারে না।

জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি, অনুরূপভাবে কোন স্থান ও নিদর্শনের মাধ্যমে তাবাররুক তথা বরকত কামনা ও প্রার্থনা করা না জায়েজ। কারণ এটি হয়তো শিরক হবে অথবা শিরকের ওসীলা বা মাধ্যম হবে। বরকত কামনার মাধ্যমে যদি এ বিশ্বাস করা হয় যে ঐ সকল বস্তু বা ব্যক্তি স্বয়ং বরকত দান করার ক্ষমতা রাখে এবং তাদের নিকট বরকত কামনা করা হলে তারা তা দেবেন, তা হলে এটি তো সরাসরি শিরক। কেননা কোন কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ রাখেন আর এসব ক্ষেত্রে বরকত প্রার্থনাকারীরা গাইরুল্লাহর কাছে বরকত তথা

বৃদ্ধির প্রার্থনা করছে। আর যদি বিশ্বাসটি এমন হয় যে তাদের জিয়ারত করা বা স্পর্শ করা অথবা তাদেরকে মাসেহ করার মাধ্যমে বরকত হাসেল হয়। উক্ত কর্মগুলো বরকত হাসেলের মাধ্যম তাহলে এটি হবে শিরকের ওসীলা যার মাধ্যমে শিরকের রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং উক্ত বিশ্বাস স্থাপনকারী ক্রমান্বয়ে শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একাজটি শিরক বা শিরক ওসীলা কিভাবে হয় ? অথচ সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমায়ীন রাসূলুল্লাহ সা.-এর থু থু, চুল এবং শরীর থেকে যা কিছু বিচ্ছিন্ন হত তা দ্বারা বরকত প্রার্থনা করতেন ? এর উত্তর হচ্ছে, এসকল কাজ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে খাস, এবং তারা এগুলো তার জীবদ্দশায়ই করেছেন সুতরাং অন্য কারো দ্বারা বা তার ইন্তেকালের পর তার ব্যবহৃত বস্তু দ্বারা এটি জায়েজ নয়।

এর প্রমাণ হল যে সকল সাহাবারা তার জীবদ্দশায় তার থু থু, চুল, শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া পানি ইত্যাদি দ্বারা বরকত নিতেন তারাই তার ইন্তেকালের পর তার ব্যবহৃত কামরা ইত্যাদি দ্বারা বরকত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপভাবে তিনি যে স্থানে বসতেন, সালাত আদায় করতেন সাহাবারা বরকতের উদ্দেশ্য সে সব স্থানে যাননি বা কোন কিছু করেননি। যখন রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে তাদের অবস্থা এরূপ তাহলে অন্যান্য ওলী আউলিয়াদের ব্যাপারে তো বিষয়টি আরো স্পষ্ট। এমনি করে সাহাবাগণ আবু বকর, ওমর, সহ অন্যান্য মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাদের দ্বারাও তাদের জীবিত থাকা অবস্থায় বা ইন্তেকালের পর কখনোই বরকত নিতেন না। তারা নামাজ পড়া ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে গারে হেরাতেও যেতেন না। যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলা নবী মূসা আ.-এর সাথে কথা বলেছেন সাহাবারা নামাজ আদায় বা দোয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যেতেন বলেও কোন প্রমাণ নেই। এছাড়াও সে সকল স্থানে বিভিন্ন কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছে নবীদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বা নবীদের সমাহিত করা হয়েছে এরূপ কোন স্থানেই বরকতের জন্য তাদের যাতায়াত ছিল না।

নবী আকরাম সা. মক্কা বা মদিনা মুনাওয়ারায় যেখানে দাঁড়িয়ে সব সময় সালাত আদায় করেছেন, সালাফে সালেহীনদের কেউ সেখানে গিয়ে সে জায়গায় স্পর্শ করেননি। চুম্বন করেননি।

অতএব যে সব স্থানে রাসূল সা. এর সম্মানিত পা চলাচল করেছে, তিনি নামাজ আদায় করেছেন, সে সকল জায়গা স্পর্শ করা ও চুম্বন করা—তিনি উম্মতের জন্য অনুমতি দেননি। তাহলে অন্যদের বসার স্থান বা নামাজের স্থান সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে ?

সুতরাং কোন বস্তু স্পর্শ করা বা চুম্বন করা কোন ক্রমেই রাসূলুল্লাহর প্রবর্তিত শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যার্জনের ক্ষেত্রে বেদআত:—

বর্তমান যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে নব প্রবর্তিত বেদআতের সংখ্যা অনেক। ইবাদতের ক্ষেত্রে মৌলিক বিধিমালা হচ্ছে—তাওক্বীফ (কোরআন সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল) দলিল প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছু অনুমোদন পেতে পারে না। যে আমলের পক্ষে দলিল নেই সেটি বেদআত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :—

من عمل عملاليس عليه أمرنافهو رد.

'যে এমন আমল সম্পাদন করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে পরিত্যাজ্য।'[১]

বর্তমানে প্রচলিত দলিল বিহীন আমলের সংখ্যা প্রচুর। যেমন—

(১) উচ্চে কণ্ঠে নামাজের নিয়্যত করা। যেমন نويت أن أصلي لله كذا وكذا... এটি বেদআত কারণ রাসূলুল্লাহ সা.এরূপ করেননি, করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন :—

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَّ بِدِينِكُمْ وَاللهُّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (الحجرات:١٦)

'বলুন : তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ তাআলা ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলস্থ যা কিছু আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[২]

নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। নিয়ত অন্তরের কর্ম। জিহ্বার কর্ম নয়।

(২) নামাজের পর জামাতবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জিকির করা। কেননা এ ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত পন্থা হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত জিকির করবে। (সুতরাং উচ্চ স্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে আদায় করা হবে বেদআত।)

(৩) বিভিন্ন উপলক্ষে, দোয়ার পূর্বে পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতেহা পড়তে বলা।

---

[১] মুসলিম
[২] সূরা : হুজুরাত-১৬

(৪) মৃতদের জন্য তাজিয়া ও মাতম অনুষ্ঠান করা, খাবার দাবার ও ভোজের আয়োজন করা, পয়সার বিনিময়ে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা। যারা এসব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে তাদের ধারণা মতে এতে করে মৃতদের উপকার হয় এবং তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অথচ এসবই হচ্ছে নিকৃষ্টতম বেদআত যার পক্ষে শরয়ি কোন দলিল নেই। এগুলো একটি কুপ্রথা এবং ধর্মের নামে বিভ্রান্তি যার পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা কোন দলিল অবতীর্ণ করেননি।

(৫) ধর্মের নামে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন করা। যেমন ইসরা ও মি'রাজ দিবস, হিজরত দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে উক্ত দিবসগুলো ধর্মীয় আমেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা। এসব উপলক্ষে ঐ দিনগুলো উদযাপন করার শরয়ি কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে রজব মাসকে কেন্দ্র করে যা করা হয়—যেমন রজবী উমরা, এবং অন্যান্য ইবাদত যথা শুধু নফল রোজা, নফল নামাজ আদায় করা—এগুলো বেদআত হওয়ার কারণ হল, রজব মাসের অন্যান্য মাসের উপর কোন প্রাধান্য নেই। এর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্যও নেই। এ মাসে আদায়কৃত হজ, উমরা, নামাজ, রোজা, ও কুরবানির উপর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

(৬) রকমারি বেশে, নানাবিধ ঢংয়ে বহুবিধ আওয়াজে বিভিন্ন জিকির আযকার করা, যা আজকালকার সুফীরা করে থাকে। এ সব নিকৃষ্ট বেদআত, এবং শরিয়ত অনুমোদিত আঙ্গিকলব্ধ ও পদ্ধতি বিরুদ্ধ।

(৭) শাবান মাসের মধ্য রজনিকে রাত জাগরণ এবং দিনকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। কেননা এ নির্দিষ্ট করনে শরিয়তের কোন দলিল প্রমাণ নেই। এবং রাসূল এসব আমল করেছেন মর্মে সহীহ কোন সনদ নেই।

(৮) প্রচলিত বেদআতের আরও একটি হচ্ছে কবরের উপর সৌধ জাতীয় কিছু নির্মাণ করা, তাকে সেজদার স্থান বানানো, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা, মৃত ব্যক্তিদের ওসীলা দেয়াসহ এজাতীয় শিরকী কাজ-কারবার। মহিলাদের কবর জিয়ারতও এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ কবর জিয়ারতকারী মহিলা এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ও বাতি প্রজ্বলিত কারীদের রাসূলুল্লাহ সা.লা'নত করেছেন।

বেদআতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর দিক:—

বেদআত কুফরির রাস্তা। দ্বীনের মধ্যে (এমন জিনিসের) সংযোজন যার অনুমোদন আল্লাহ ও রাসূল কেউ দেননি। বেদআত নিকৃষ্ট ধরনের কবিরা গুনাহ।

শয়তান কবিরা গুনাহ দ্বারা যতটুকু আনন্দিত হয় বেদআতের দ্বারা এর চেয়ে বহু গুন বেশি খুশি হয়। কেননা গুনাহ্গার পাপী পাপকে পাপ মনে করে পাপ করে ফলে কোন এক সময় তাওবা করে নেয়। পক্ষান্তরে বেদআতি বেদআতকে দ্বীন জ্ঞান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বেদআত কর্ম সম্পাদন করে। ফলে কখনো তাওবা করার প্রয়োজন অনুভব করে না বরং তাওবা করেও না।

বেদআত সুন্নতকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে দেয়। এবং বেদআতপন্থীদের নিকট সুন্নত ও সুন্নত প্রেমীদের ঘৃণিত ও নিন্দিত করে তুলে।

বেদআত সম্পাদনকারীকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার ক্রোধ ও শাস্তিকে আবশ্যক করে তোলে। অন্তর বিনষ্ট ও বক্র করে দেয়।

বেদআত বিতাড়নে হিকমত ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা :—

পূর্বে আলোচিত অনেক বেদআতই অনেক মুসলমানদের জীবনে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে খুব প্রগাঢ় ও দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে। তারা এসব বেদআতকে দ্বীনেরই একটি অংশ মনে করে এবং ভাবে—এ সকল কাজ সম্পাদন না করলে দ্বীনদারী লঙ্ঘন হবে। তা ছাড়া সুবিধাভোগী কিছু লোকের এসব কর্ম প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নিরলস পরিশ্রমও একটি বড় কারণ। এ পরিস্থিতি ও পরিবেশ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.-এর প্রকৃত অনুসারী এবং তার আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমাজ সংস্কার ও বেদআত বিতাড়নে রাসূলুল্লাহর নীতি আদর্শ ও তার পথ ও পদ্ধতি অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। যেমন: ধৈর্যধারণ করা, মনকে প্রশস্ত করা, কষ্ট সহিষ্ণু মনোবৃত্তি, উত্তম ব্যবহার ও চরিত্র প্রদর্শন করা এবং নির্দেশ বর্ণনা করার সময় উত্তম পন্থা ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা যা হক গ্রহণ ও বাতেল পরিহার করনে উৎসাহ প্রদান করবে। আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলছেন—

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ . (آل عمران:١٥٩)

'আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছে থেকে দূরে সরে যেত।'[১]

দাওয়াত কর্মীদের অতীব গুরুত্ব পূর্ণ হচ্ছে :—

তাদের সুন্নত সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে। সুন্নতের অনুসরণের মর্তবা ও গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ, পথ ও কর্মপন্থা অনুকরণের বরকত সম্বন্ধে ধারণা

---

১ সূরা : আলে ইমরান-১৫৯

রাখতে হবে। এবং এটিই যে তার মুহব্বতের দলিল সেটিও বুঝতে হবে। আর তার আদর্শ ও সুন্নতের বিরোধিতায় মানুষকে রাসূলুল্লাহর সুন্নত ও আদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অনুসারী সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং দ্বীনের পথে অগ্র সেনানী হেদায়াতের রাহবারদের রাস্তা থেকে দুরে সরিয়ে দেয়—সে সম্পর্কে ও ধারণা থাকতে হবে।

বেদআত বিতাড়নে একটি প্রজ্ঞাময় কর্ম পদ্ধতি :—

বেদআত বিতাড়ন করতে গিয়ে বেদআতে নিমজ্জিত মানুষদেরকে বলা হয় আপনারা যা করছেন এগুলোতো সব বেদআত যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়—তাহলে মানুষ তার কথা শুনবে না বরং বিরোধিতা করবে। আর যদি বেদআত নাম না নিয়ে সুন্নতের মুহাব্বত ও রাসূল সা.-এর অনুসরণের মর্যাদা কি তাকে ভালবাসার স্বরূপ কি, সুন্নতের অনুসরণই যে তাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা—ইত্যাদি পদ্ধতিতে কাজ করা হয়, তাহলে এটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এবং সুন্নতের প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। ফলে ধীরে ধীরে সুন্নতের প্রসার ঘটবে আর বেদআত উঠে যাবে। তাতে মূল কাজ বেশি হবে। তাই দাওয়াত কর্মীদের বেদআতের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে জেহাদে অবতীর্ণ না হয়ে সুন্নতের প্রসারতায় আত্মনিয়োগই হবে অধিক ফলদায়ক। আল্লাহ আমাদের সহায় হন।

সমাপ্ত